দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাসের জেরে ঘরছাড়া, রাজ্যছাড়া, দেশছাড়া — পৃঃ ২৩

পঞ্চায়েতে তৃণমূলের জয় ম্লান হয়েছে সন্ত্রাস ও হিংসায়— পৃঃ ২৫

৭৫ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা।। ২৪ জুলাই, ২০২৩।। ৭ শ্রাবণ - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

রক্তস্নাত পঞ্চায়েত

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ৭ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২৪ জুলাই - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

'মুমকিন, না-মুমকিন' কেন ভূতের বেগার খেটে মরিস মিছে... ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

দিদিকে আচার্য দেখতে চাই, উচ্ছন্নে যাক উচ্চশিক্ষা ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

ছোটো ছোটো আঞ্চলিক দলগুলি বিজেপির সঙ্গেই জোট বাঁধতে আগ্রহী ◻ স্বপন দাশগুপ্ত ◻ ৮

মোদী সরকারের আর্থিক নীতির দরাজ প্রশংসা মার্কিন সংস্থার রিপোর্টে ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

নালন্দা থেকে মার্সাই একই ছবি ◻ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ◻ ১১

নির্বাচনের নামে পশ্চিমবঙ্গের রক্তস্নান ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৩

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি সব বাধা কাটিয়ে সারা দেশে চালু হতে চলেছে ◻ ড. বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায় ◻ ১৫

গণতন্ত্র ভারতের ডিএনএ-তে আছে : আমেরিকায় মোদী ◻ শিতাংশু গুহ ◻ ১৮

পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের জয় ম্লান হয়েছে সন্ত্রাস ও হিংসায় ◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ২৩

প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি ◻ শতদ্রু সিনহা রায় ◻ ২৬

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ভারতীয় রসায়নের ঋষি ◻ অধ্যাপক (ড.) স্বাগত বোস ◻ ৩১

জগদ্‌গুরু ভারত ◻ ডাঃ দিলীপ কুমার সরকার ◻ ৩৩

মনমণ্ডপে মানুষ পুজো ◻ অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ ◻ ৩৪

বঙ্গদেশের সঙ্গে শ্রীরামের যোগ বহু প্রাচীন ◻ ড. অনিল কুমার ঘোষ ◻ ৩৫

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাসের জেরে ঘরছাড়া, রাজ্যছাড়া, দেশছাড়া ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ৪৩

বাঙ্গালি হিন্দুর শেষ আশ্রয়স্থল পশ্চিমবঙ্গ ◻ অবিনাশ ভট্টাচার্য ◻ ৪৫

আত্মহত্যা মহাপাপ ◻ সজল কুমার গুহ ◻ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৮ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ খেলা : ৪৮ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯ ◻ চিত্রকথা : ৫০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৩১ জুলাই, ২০২৩

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ৩১ জুলাই, ২০২৩

চন্দ্রযান ৩ : ভারতের সফল উৎক্ষেপণ

চন্দ্রযান-২-এর দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির পর দেশে বিদেশে অনেকেই কটাক্ষ করেছিলেন। ভাবখানা এইরকম— ভারতের মতো দেশের এসব ব্যাপারে মাথা ঘামানোর দরকার কী? চন্দ্রযান-৩-এর সফল উৎক্ষেপণ ঘটিয়ে ভারত তার জবাব দিয়েছে। প্রমাণ করেছে, কোনো ব্যর্থতাই ভারতের অগ্রগতিকে দমিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। চন্দ্রযান-৩ যদি চাঁদে অবতরণ করতে সফল হয় তাহলে তা হবে নতুন ভারতের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে চন্দ্রযান-৩ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রক্তস্নাত গণতন্ত্র

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে পরিচিত আমাদের ভারত। ইহা ভারতবাসীর গর্ব। কিছুদিন পূর্বেই প্রধানমন্ত্রী তাঁহার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সফরে মার্কিন কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে সগৌরবে ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন যে ভারতের ডিএনএ-তে রহিয়াছে গণতন্ত্র। ভারত-সহ বিশ্বের কোণে কোণে বসবাসরত ভারতীয়রা ইহাতে গৌরব অনুভব করিলেও ভারতেরই একটি অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ তাহার সহভাগী হইতে পারিতেছে না। পশ্চিমবঙ্গবাসী বহু বৎসর যাবৎ অবাধে ভোটদানের মতো গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। নির্বাচনকে গণতন্ত্রের উৎসব বলিয়া অভিহিত করা হইলেও বামেদের চৌত্রিশ বৎসর এবং বর্তমান শাসকদলের বারো বৎসর সেই গণতন্ত্রের উৎসব রক্তরঞ্জিত হইয়াছে। নির্বাচনে যে রক্তের খেলা বামেরা শুরু করিয়াছিল তাহারই আরও উন্নত রূপ প্রদান করিয়াছে বর্তমান শাসক দল। ২০২১ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা সমগ্র দেশ দেখিয়াছে। তাহাতে ভারত শুধু নহে সমগ্র বিশ্ব শিহরিয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র বিশ্বে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ধিক্কৃত হইয়াছিলেন। আশা করা গিয়াছিল শাসক দল হয়তো সংযত হইবে। কিন্তু তাহার মাত্র তিন বৎসর পর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেশবাসীকে হিংসার আরও আরও উন্নত রূপ দেখিতে হইল। রাজ্য সরকার তাহার বশংবদ আমলাকে নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করিয়া পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণা করিবার পর হইতেই হিংসায় দীর্ণ হইয়াছে রাজ্য। নির্বাচনের নামে প্রহসন হইয়াছে। মানুষ অবাধে তাহাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। তাহার উপর ভোট লুট, ছাপ্পাভোট, ব্যালট পেপার ছিনতাই, ব্যালট বক্স ছিনতাই, ভোটদাতাদের মারধর অবাধে চলিয়াছে। রাজ্যের পুলিশ শাসকদলের বাহুবলীদেরই পক্ষ লইয়াছে। ভোটকর্মীরা প্রাণের ভয়ে শাসকদলের গুন্ডাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দিন হইতে ফলাফল ঘোষণার পরদিন পর্যন্ত পঞ্চাশ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হইয়াছে। নির্বাচনের নামে রক্তের হোলি খেলায় পুলিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয় থাকিয়াছে। নির্বাচন কমিশনার নীরব থাকিয়াছেন। গণতন্ত্রকে রক্তরঞ্জিত করিয়া জয়লাভ করিয়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অতিশয় পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন গণতন্ত্রের উৎসবে তাঁহার দলের যে উনিশ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে, কেবলমাত্র তাহাদেরই হোমগার্ডের চাকুরি এবং দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

এই কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হইয়াছে । কিন্তু হাস্যকর বিষয় হইল, বামেরাও চিৎকার করিতেছে, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া। তাহারা কীরূপে ভুলিয়া যাইতেছেন যে তাহারাই গণতন্ত্রের কবর খনন করিয়াছেন। গণতন্ত্রকে রক্তরঞ্জিত করিবার সমস্ত অপকৌশল তাহারাই প্রয়োগ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গকে তো তাহারাই সর্বদিক দিয়া দেউলিয়া করিয়াছেন। এই রাজ্যের মানুষের মেরুদণ্ড তো তাহারাই ভাঙিয়া দিয়াছেন। বর্তমান শাসকদলের নেত্রী তো তাহাদেরই যোগ্যতম উত্তরসূরী। বামেদের কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ দেখিয়া এই দুঃখের দিনেও মানুষ হাসিতেছে। মানুষ বামেদের সহিত বর্তমান শাসকদলকে আলাদা ভাবিতে পারিতেছে না। উভয় দলই খুনি। এই রাজ্যে গণতন্ত্র হত্যার দায় উভয় দলেরই।

আর সবচাইতে হাস্যাস্পদ হইতেছেন এই রাজ্যের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীকুল। গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে কিছু ঘটিলেই এই রাজ্যের যে বুদ্ধিজীবীকুল রাত্রিতে সুখনিদ্রা যাইতে পারেন না, পদযাত্রায় শামিল হইয়া রাজপথ মুখরিত করিয়া তোলেন, মোমবাতি হাতে নিন্দায় মুখর হন; পশ্চিমবঙ্গে সামান্য পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া এত রক্ত দেখিয়াও তাঁহারা নীরব কেন? গণতন্ত্র রক্ষায় যাহাদের লেখনী অক্লান্ত, গণতন্ত্রের মৃত্যু দেখিয়াও তাহাদের লেখনী স্তব্ধ কেন? রাজ্যের মানুষ তাহাদের চিনিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারা কোনোমতেই বুদ্ধিজীবী নহেন, তাঁহারা উচ্ছিষ্টভোগী মাত্র। পশ্চিমবঙ্গবাসীর ভাগ্য নিতান্তই ভালো যে রাজ্যের বিচারব্যবস্থা জাগ্রত রহিয়াছে। কিন্তু শুধুমাত্র বিচারব্যবস্থার হাতে নিজেকে সঁপিয়া দিলে তো ভাগ্যোদয় ঘটিবে না। মরিতে মরিতেও ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া এই অন্ধকারের অবসান ঘটাইবার সংকল্প করিতে হইবে।

সুভাষিতম্

বনেঽপি সিংহা মৃগমাংসভক্ষিণো বুভুক্ষিতা নৈব তৃণং চরন্তি।

এবং কুলীনা ব্যসনাভিভূতা ন নীচকর্মাণি সমাচরন্তি।।

জঙ্গলে মৃগমাংসভক্ষী সিংহ ক্ষুধার্ত হলেও যেমন ঘাস খায় না, তেমনই সুসংস্কারিত ব্যক্তি সংকটকালেও নীচ কর্ম করেন না।

‘মুমকিন, না-মুমকিন’
কেন ভূতের ব্যাগার খেটে মরিস মিছে...

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

সবাই জানেন এই রাজ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপির কোনো কার্যকরী ভূমিকা নেই। সিপিএম-কে সরাতে ‘সুহৃদ-সঙ্ঘ’ মার্কা সুশীল সমাজ বানিয়েছিলেন মমতা। বাম বিরোধী লড়াইয়ে তারাই পুরোধায় ছিলেন। তেমন কোনো ফোরাম বা আর্টিস্ট ক্লাব আজ পর্যন্ত তৈরি করতে পারেনি বিজেপি যার থেকে রাজ্যের মানুষের সামনে বিজেপিকে ‘বহিরাগত’ নয় বলে তুলে ধরা যেতে পারে। রাজ্যের মানুষ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরসূরি পায়নি বলা যেতে পারে। কারণটা অজানা নয় আর আন্দাজও করা যায়। সাংগঠনিক দুর্বলতা আর কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থ তার প্রধান অন্তরায়। সঠিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন বেঠিক হাতে পড়লে তা নষ্ট হতে বাধ্য। তাই দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। পঞ্চায়েত ভোটে গ্রামবাঙ্গলার ৪৯ শতাংশ ভোটার মমতা বিরোধী। মমতাকে হারানোর আদর্শ পরিবেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপাতত তা সম্ভব হয়নি।

কারণ বিরোধী ভোট ত্রিমুখী আর ভোট ভাগাভাগিতে মমতা প্রত্যেক বিরোধী রাজনৈতিক দলের তুলনায় কয়েক যোজন এগিয়ে। মমতার ভোটার আমার অবাঙ্গালি এক বন্ধুর তাই প্রশ্ন ছিল, কেন নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় থাকলে (মোদী হ্যায়) মমতাকে হারানো ‘না-মুমকিন’ বা অসম্ভব। রাজ্যজুড়ে এটা সাধারণ ধারণা। উত্তরটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কায়দা করে দিয়েছেন রাজ্য বিজেপির ভূয়সী প্রশংসা করে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অনভিজ্ঞ রাজনীতিক তৃণমূলের নতুন মুখ। অথচ চার বছর আগে বিজেপিতে যোগ দেওয়া অভিজ্ঞ রাজনীতিক শুভেন্দু অধিকারী এখন পর্যন্ত রাজ্য বিজেপির মুখ বলে ঘোষিত নন। মোদী আর মমতাকে ঘিরে আমার ওই বন্ধুর ভুল ধারণাটি মুছতে এ রাজ্যের বিরোধী শিবিরকে অনেক কসরত করতে হবে। কেবল ‘চ্যানেল বিপ্লব’ আর ‘সেটিং’ তত্ত্ব আউড়ে মমতা বিরোধিতায় শান পড়বে না। ভোটে তিন বড়ো রাজনৈতিক দল মিলে ৪১ শতাংশ ভোট পেয়েছে আর মমতা একা ৫১ শতাংশ যা অবশ্য ২০১৮-র থেকে ৫ শতাংশ কম।

সিপিএম হটানোর তিন বছর আগে (২০০৮) পঞ্চায়েত ভোটে মমতার তৃণমূল ২৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এবার বিজেপি সেই সময়ের তৃণমূলের পাওয়া আসনের সমপরিমাণ গ্রামপঞ্চায়েত আসন পেয়েছে। আর বিরোধীরা পেয়েছিল ৪৮ শতাংশ ভোট। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রোজকার ফাঁকা হুংকার, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন আর ৩৫৫ ধারা জারি করা নিয়ে টালবাহানা থেকে ধারণা হয় মমতাকে বেকায়দায় ফেলার ব্যাপারে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কোথাও একটা সামগ্রিক অনীহা রয়েছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে মোদী-মমতার রহস্য জোট নিয়ে রাজ্যপাটের লেখা রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় ফেলেছিল যদিও কেউ আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানায়নি। যতদিন না রাজ্যের মানুষ মমতাকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করছে মোদী-মমতার এই রহস্য সমীকরণের ধারণাটি নিয়ে আলোচনা চলতে থাকবে।

> ‘এতটা এগিয়েও শাসকদল কেন সন্ত্রাস আর হিংসার রাস্তা ধরল? কারণ এ রাজ্যের প্রতিটি সকাল এখন রাতের চেয়েও অন্ধকার।’

দু’ নেতাই চূড়ান্ত বাম আর কংগ্রেস বিরোধী। তাই শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী মমতাকে ভোট কাটুয়া বলেন অথচ বেঙ্গালুরুতে মোদী বিরোধী জোটে তাকে ডাকতে কসুর করেন না। লজ্জার মাথা খাওয়া সুবিধাবাদী বামেরাও ওই জোটে মমতার সঙ্গে সওয়ারি হয়েছে। এ রাজ্যে ‘না-মুমকিন’ কে ‘মুমকিন’ করে তোলার দায়িত্ব বিজেপির। তবে তারা প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে না। সাংগঠনিকভাবে তৃণমূলের থেকে তারা এখন অনেক পিছিয়ে। ফলে তৃণমূলের চাতুরি আর সন্ত্রাস মোকাবিলা করার সাংগঠনিক ক্ষমতা তাদের নেই।

মমতা যখন সিপিএমকে সরিয়েছিল পুলিশের একটা বড়ো অংশ তাঁকে সাহায্য করেছিল। শাসকের পাশ থেকে পুলিশ সরে গেলে সে মূষিক হয়ে যায়। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলকায় ১৫৬টির মধ্যে বিজেপি মাত্র ৩৮টি আসন পেয়েছিল। তাই গ্রামবাঙ্গলার আশীর্বাদ বিজেপির ওপর রাতারাতি এসে পড়বে এটা মূর্খের ভাবনা।

একটাই প্রশ্ন, এতটা এগিয়েও শাসকদল কেন সন্ত্রাস আর হিংসার রাস্তা ধরল? কারণ এ রাজ্যের প্রতিটি সকাল এখন রাতের চেয়েও অন্ধকার। প্রতিদিনের সূর্যকে শ্মশানের চিতা বলে মালুম হয়। আর পাখির কূজনে হাহাকার। রাজ্যকে শ্মশান মুক্ত করাই এখন প্রধান কাজ।

দিদিকে আচার্য দেখতে চাই

উচ্ছন্নে যাক উচ্চশিক্ষা

রাজনীতিকেষু দিদি,

বাংলা পুড়ছে। রক্তে হোলি খেলা চলছে। আবার বন্যায় ভাসছে উত্তরবঙ্গ। দিদি তখন আপনি অনেক বড়ো কাজ করছেন। এসব তো হতেই থাকবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে খান পঞ্চাশ মানুষের মৃত্যু আর এমন বড়ো খবর কী! বাংলার কিছু রাজনীতি-প্রেমী মানুষ শাসক তৃণমূলের ভয়ে অন্য রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। তবে সে সব ছেড়ে দিদি আপনি যে লোকসভা নির্বাচনের জন্য জোট বাঁধতে ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছেন সেটা অনেক বেশি জরুরি। কারণ, বিজেপিকে সরিয়ে আপনি প্রধানমন্ত্রী হতে না পারলে আসল কাজটা হবে না। আমি দিদি, আপনাকে দেশের প্রধানমন্ত্রীর থেকেও বড়ো করে সব কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে দেখতে চাই।

আসলে আপনি আচার্য হতে যে চান সেটা কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। বিধানসভায় বিল পাশ করানোর পরেও আপনার রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য হওয়া হলো না। আপনার মতো একজন বিভিন্ন বিষয়ে মানে সব বিষয়ে বিপুল ব্যুৎপত্তি থাকা মানুষকে কেন আচার্য করা হবে না সেটাই তো আমার প্রশ্ন। কিন্তু দিদি, এই যে আপনার আচার্য হতে না পারা এবং সাংবিধানিক ভাবে আচার্য হওয়া রাজ্যপালের অধিকারে প্রয়োগের ফলে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার হাল কিন্তু বেহাল। তবে তাতে কীই-বা এসে যায়। ওই তো পড়াশোনার হাল। ছেলে-মেয়েরা ভালো কিছু করতে হলে এমনিতেই তো অন্য রাজ্যে চলে যায়। তাই বাংলার শিক্ষার বিষয়টা না ভেবে আপনি রাজভবনের সঙ্গে যে লড়াইটা করছেন সেটাই ঠিক। আপনার এই ক্ষেত্রের সেনাপতি, নাট্যকার তথা অভিনেতা ব্রাত্য বসুও খুবই পারদর্শী। একের পরে নির্দেশ শিক্ষামন্ত্রী দিচ্ছেন বটে, তবে কিছুই ধোপে টিকছে না। আসলে সবটাই তো অনিয়ম। তবে অনিয়মের তোয়াক্কা আপনি দিদি আর কবেই-বা করেছেন। অনিয়মকে নিয়ম বানানোর ক্ষেত্রে আপনার জুড়ি মেলাই ভার।

উপাচার্য নিয়োগ ঘিরে যে নাটক হয়ে চলেছে তাকে অনেকে অবশ্য ছেলেখেলা বলছে। কে ঠিক আর কোনো পক্ষ আইন মেনে পদক্ষেপ করছে, কেই-বা অধিকারের জোরে নির্দেশ চাপিয়ে দিচ্ছেন তা নিয়ে তর্কে আমি যেতে চাই না। তবে মাঝে মাঝে মনে হয় বাংলার জন্য, বাংলার শিক্ষার ভবিষ্যতের জন্য বিষয়টা ভালো নয়। আবার এটাও ভাবি যে, আপনি যখন করছেন তখন নিশ্চয়ই ভালো কিছুই হবে। এই সব কিছুর প্রভাব যে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপরে পড়ছে তা কিন্তু মানতেই হবে। রোজকার পঠনপাঠন থেকে অর্থ বরাদ্দ, নিয়োগ-সহ নানা ক্ষেত্রেই সব থমকে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তাবৎ সিদ্ধান্তের নিয়ন্তা উপাচার্য। কিন্তু তাঁরা সকলেই অস্থায়ী।

জগদীপ ধনখড় রাজ্যপাল থাকাকালীনও উপাচার্য নিয়োগ ঘিরে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত চরমে উঠেছিল। এতটাই হয়েছিল যে, আপনার সরকার আপনাকে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য করে তোলার লক্ষ্যে বিলের খসড়া পর্যন্ত তৈরি করে। কিন্তু আমি দেখতে না চাইলেও দোষ কি সরকারেরও নেই! রাজ্যের এক গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় থাকতে থাকতে পরবর্তী স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের কথা না ভেবে, উপাচার্যদের মেয়াদ শেষের মুখে একটু একটু করে কার্যকাল বাড়িয়ে চলা, 'অস্থায়ী' উপাচার্যদের দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় চালানো কোনও সমাধান হতে পারে কি? এই নিয়েই তো বর্তমান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে আপনার সরকারের মতান্তর। সরকারের সঙ্গে পরামর্শ না করেই তাই রাজ্যপাল অস্থায়ী বা অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগ করছেন। লড়াই করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী সেই উপাচার্যদের নিয়োগপত্র গ্রহণ না করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। সেই নির্দেশ না-মানা উপাচার্যদের বেতন ও ভাতা রাজ্য সরকার বন্ধ করে দিচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা সব দেখছে। সেটা ভালো হচ্ছে কি? তবে আপনি যখন করছেন তখন ভালো তো নিশ্চয়ই হচ্ছে।

একটা সময়ে দিদি, উচ্চমানের বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার কথা বলতেই দেশের গন্তব্য ছিল বাংলা। বাম জমানেতেই সেটা গিয়েছে। শিক্ষাদরদি ব্যক্তিত্ববান উপাচার্যদের নেতৃত্বে এবং প্রশাসনের সর্বৈব সহযোগিতায় একটি ভালো বিশ্ববিদ্যালয় কেমন করে চলে তার শিক্ষণীয় উদাহরণ ছিল বাংলা। কিন্তু বামেরা দলদাসদের বসাতে শুরু করেন। সেটার নাম দেওয়া হয়েছিল 'অনিলায়ন'। কারণ, মূলত কাজটা করতেন সিপিএমের তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। এখন চলছে 'তৃণমূলায়ন'। সেটা না হলে আপনার প্রিয় আমলার স্ত্রী সোনালী চক্রবর্তী, রাজনীতিক ওমপ্রকাশ মিশ্র, এখন জেলবন্দি সুবীরেশ ভট্টাচার্যরা কি উপাচার্য হতে পারতেন? ◻

এখন চলছে 'তৃণমূলায়ন'। সেটা না হলে আপনার প্রিয় আমলার স্ত্রী সোনালী চক্রবর্তী, রাজনীতিক ওমপ্রকাশ মিশ্র, এখন জেলবন্দি সুবীরেশ ভট্টাচার্যরা কি উপাচার্য হতে পারতেন?

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

ছোটো ছোটো আঞ্চলিক দলগুলি বিজেপির সঙ্গেই জোট বাঁধতে আগ্রহী

রাজনৈতিক শ্রেণী মহারাষ্ট্রে অন্তহীন দল বদলের খেলায় মেতে থাকলেও সাধারণ জনতা বিষয়টাকে খুব ভালো ভাবে নিচ্ছে না। এই হঠাৎ দল ছেড়ে নতুন সমীকরণ নির্মাণ বড়ো কোনো রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ক্ষেত্রে হলে অবশ্যই বেশি বোধগম্য হতো। কিন্তু ২০১১ সালে তদানীন্তন শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে এনডিএ ছেড়ে বেরিয়ে যান। সেটিই নির্বাচনী জনাদেশের ওপর তীব্র কষাঘাত এবং তাকে এক লহমায় তুচ্ছ করা। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার উচ্চাশায় কংগ্রেস ও এনসিপি-র সঙ্গে জোট বাঁধার কৌশলটিই রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাকে সম্পূর্ণ ভুলুণ্ঠিত করে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণের পথ হিসেবেই চিহ্নিত হয়।

সে সময় একনাথ শিন্দে বাহিনীকে গৌহাটির হোটেলে রেখে তাদের দলীয় বিপ্লবকে মর্যাদা দেওয়া হয় আর এখন অজিত পাওয়ার তাঁর অশীতিপর কাকাকে ছেড়ে নতুন উদ্যমে বিজেপির সঙ্গে যোগ দিলেন। এই দুটি নবোত্থানের অন্তরালেই বিজেপিকে দায়ী করা হচ্ছে। মজার কথা, এই দুটি ক্ষেত্রেই বিজেপি কখনই বিরোধিতা করেনি বা বিশদে কোনো মত ব্যক্ত করেনি। তারা শুধু এই পরিবর্তনের মূলে যে রাজনৈতিক উচ্চাশার পোষণ তাতেই হয়তো কিছুটা জল সিঞ্চন করেছে। পরিবর্তনকারী নেতারা ভেবেছিলেন তাঁরা দলে থেকে মরুভূমিতে অবস্থান করছেন।

সত্যি কথা বলতে কী, এই দুটি ক্ষেত্রেই বিজেপি অত্যন্ত উদার হাতে পরিস্থিতি সামলেছে। তার নিজের দলের নেতাদের পথ যে নবাগতরা রুদ্ধ করেছে, দল সেটাও আপোশে, আলোচনায় সচল রেখেছে। এই নতুন পরিস্থিতি ২০২৪-এর নির্বাচনের আগে এনডিএ-র কোনো নবনির্মাণ নাকি বহু মোদী বিরোধী দল যারা কোনোরকমে মিলেজুলে মোদীকে হারাতে চায়, সেই দলগুলির আত্মবিশ্বাসকে গোড়াতেই বিনষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা সেটা এই মুহূর্তের সংবাদ ভিত্তিতে ধরে নেওয়া ঠিক নয়। তবে একটা জিনিস দিবালোকের মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে যে রাজনীতিতে অতীত শত্রুতা বা আদর্শগত ফারাকের তত্ত্ব ভবিষ্যতের সুমধুর সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়।

এই সূত্রে জাতীয় বিরোধী দলগুলির কাছ থেকে কয়েকটি ব্যাখ্যা চাওয়া যেতেই পারে। কংগ্রেস ও সিপিএম মহানন্দে দিল্লিতে ভাই-ভাই খেলছে আর কেরালায় খুনের হোলি নিশ্চিন্তে চলছে। একইভাবে পাটনায় মমতা ব্যানার্জির উপস্থিতিতে সীতারাম ইয়েচুরিকে দেখা গিয়েছে আর বেঙ্গালুরুতেও সীতারামকে দেখা গিয়েছে। যাইহোক, এই সব ছোটো জোড়াতালিকে রাজ্যে রাজ্যে ঘটতে দেখলেও বৃহত্তর পরিসরে দেখলে কংগ্রেস এইসব ছোটো দলের সঙ্গে সমভাবে তাদের উত্থানকে আদৌ সানন্দে মেনে নিতে পারছে না। বিজেপির কিন্তু এ বিষয়ে দলের সদস্যদের কাছে দেওয়ার মতো বিশ্বাসযোগ্য একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি সর্বভারতীয় দল যে পরপর দুটি লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে তার কিছুটা গর্বিত মনোভাব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বাস্তবে দল বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে অজিত পাওয়ার, প্রফুল্ল প্যাটেল বা পঞ্জাবের বাদলদের মতো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের ওপর অসাধারণ মহানতা ও সৌহার্দ্য নাগাড়ে বর্ষণ করে চলেছে। দল এদের কামনার ঝুলি ভরিয়ে দিচ্ছে। নির্বাচনী রাজনীতির পাটীগণিতে অমিত শাহ কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নন।

> ‘এই বিশাল ভারতীয় রাজনৈতিক দলটির প্রাচীন বিশ্বাসকে মর্যাদা দিতে তারা নীরবে ও গভীর প্রতিজ্ঞায়, কায়মনোবাক্যে যে কাজগুলি করেছে তা একমাত্র মোদী সরকারই পারে।’

দ্বিতীয়ত, এটি সেই দল যারা তাদের আদর্শগত নিজস্ব ভাবমূর্তির ওপর বাড়তি গুরুত্ব দেয়। এই নিরিখে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দলে হঠাৎ হঠাৎ দীর্ঘদিনের বৈরী মানসিকতার রাজনীতিকদের প্রবেশ প্রধানমন্ত্রী মোদীর দীর্ঘদিনের গভীর ব্যক্তিগত সততা ও নৈতিকতার নীতির ওপর যে বিপরীত চাপ দিচ্ছে। পুরনো আস্থাবানরা যথেষ্ট বিরক্ত হচ্ছেন। এই ধরনের কিছুটা নীতিবিবর্জিত ঘটনাপ্রবাহ আজ আদর্শগত রাজনৈতিক অবস্থানকে যেন অনেকটাই পেছনের আসনে ঠেলে দিয়েছে। এই সবের মূলেই রয়েছে নির্বাচনী বোঝাপড়ার বাধ্যবাধকতা।

এর কোনো সহজ সমাধান হাতে নেই। অবশ্যই মোদী যখন ২০২৪-এর নির্বাচকমণ্ডলীর মুখোমুখি দাঁড়াবেন সে সময় তাঁর এই পরিতৃপ্তি থাকবে যে তিনি তাঁর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলির অধিকাংশকেই বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর প্রতি বিশ্বস্তরা অবশ্যই বুঝতে

পারবে যে তাঁর দল ও তিনি বাজারের ঝড়তি-পড়তিদের থেকে অনেকটাই আলাদা। মনে পড়বে, ভারত একটি পারমাণবিক শক্তি হিসেবে প্রথম মাথা উঁচু করে ১৯৯৮ সালে ভারতরত্ন বাজপেয়ীর হাত ধরে। ৩৭০ ধারার অন্যায়ভাবে দীর্ঘদিন জারি থাকা থেকে বিলোপ সাধন, একইসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের যথাযথভাবে একত্রীকরণ ও সংহতি স্থাপন এক অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই রাজ্যটি আজ অন্য রাজ্যগুলির মতো সব শর্তেই ভারতীয় ইউনিয়নের পূর্ণ সদস্য হতে পেরেছে ২০১৯ সাল থেকে। কয়েক লক্ষ রামভক্ত যারা রক্তার্পণের মাধ্যমে ৯০-এর দশকে করসেবা করে রামমন্দির নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং আজও যাঁরা জীবিত আছেন তাঁরা তাঁদের জীবদ্দশাতেই ২০২৪ সালে স্বপ্নলালিত পূজা ভব্য একটি রামমন্দিরে অর্পণ করতে পারবেন। আর একটি বরাবরের এড়িয়ে যাওয়া মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড)। ২০২৪-এ দেশবাসী যখন নতুন সরকার নির্বাচন করবে তখন তা হয়তো আইনে পরিণত হয়ে যাবে। দূরে নয়, মাত্র আগামী বছরে এই বিশাল ভারতীয় রাজনৈতিক দলটির প্রাচীন বিশ্বাসকে মর্যাদা দিতে তারা নীরবে ও গভীর প্রতিজ্ঞায়, কায়মনোবাক্যে যে কাজগুলি করেছে তা একমাত্র মোদী সরকারই পারে।

এই ঐতিহাসিক কার্যক্রমের ধারা সেই সমস্ত দল ও তার নেতারা যারা গৈরিক ভাবনার পরীক্ষায় খুব নিদারুণভাবে ব্যর্থ হন না তাঁদের শাসক দলের ছত্রছায়ায় এই দলত্যাগীদের জায়গা করে দেওয়া তেমন কিছু সুদূর প্রভাবশালী নয়। অমিত শাহ'র মারাঠা ইতিহাসের নিবিড় পাঠ ও গভীর উপলব্ধির মাধ্যমে তিনি হয়তো মারাঠাদের মধ্যে 'হিন্দুপদ পাদশাহী' নামক ঐতিহাসিক শব্দটি যা সাভারকর দ্বারা আজন্ম পূজিত, তার সঙ্গে একটি তুলনা খুঁজে পেয়েছেন। মারাঠা সৈন্য বিভাগে সে সময় ভাড়াটে সৈন্যের অভাব ছিল না। ইতিহাসের আরও গভীরে গিয়ে তিনি বুঝেছেন ১৭৬১ সালের অসীম ভারত টলানো পানিপথের যুদ্ধ বিপর্যয় হয়তো ঘটতই না যদি মারাঠারা তাদের অতি আত্মবিশ্বাসের ভাঁড়ার একটু উন্মোচন করে তুলনায় ছোটো কিন্তু মারাঠা প্রদেশের আশপাশে থাকা প্রতিবেশীদের একটু লড়াইয়ের সঙ্গী করতেন।

উপসংহারে বলা যায়, কোনো দুটি নির্বাচন কখনই এক নয়। ২০২৪-এর ভোট এখনও ৯ মাস দেরি আছে। কিন্তু সাম- দাম-দণ্ড-ভেদের অক্ষয় নীতি পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। ভারত উন্নয়নের পথে তার সার্থক নৈতিক প্রয়োগ কোথায় ও কখন হতে চলেছে তা নির্বাচকমণ্ডলীর গোচরেই আছে।

(লেখক রাজ্যসভার সদস্য এবং স্তম্ভলেখক)

যোগ চিকিৎসা ডিপ্লোমা কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এন্ড রাজযোগ

(D.A.T.H.R.Y.)

পাঠ্যসূচী ঃ- ইনট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ, অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুট এন্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস্, ইন্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজ (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারোপ্যাথি, রাজযোগ ও কুণ্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাকটিস, স্ট্রেস (Stress) ম্যানেজমেন্ট, যোগ প্রাক্টিক্যাল (আসন-প্রাণায়াম-মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাজ (যোগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্টিস টিচিং।

সময়কাল : ১ বছর। ৩০ জুলাই থেকে আরম্ভ।

যোগ্যতা : ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ।

ক্লাস : প্রতি রবিবার ১টা থেকে ৪টা।

1977

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ

Regd. NGO, NITI AAYOG, New Delhi -, Govt,. of India

কোর্স ফি : ১০,০০০ টাকা। এককালীন ৮০০০ টাকা।
ইনস্টলমেন্টে প্রথমে ৫০০০ টাকা, পরের মাসে ২৫০০ টাকা করে।

ফর্ম ও প্রসপেক্টাস : ১০০ টাকা

১০১, সার্দান অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ২৯

9051721420 / 9830597884/9836522503

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

মোদী সরকারের আর্থিক-নীতির দরাজ প্রশংসা মার্কিন সংস্থার রিপোর্টে

বিরোধীরা প্রায়শই অভিযোগ করে থাকেন মোদী জমানায় নাকি ভারতীয় অর্থনীতির পতন হয়েছে। এর স্বপক্ষে যে উদাহরণটিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা তাঁরা করেন সেটি হলো ২০১৬ সালে নোটবন্দি করার ঘটনাটিকে। আর্থিক দুর্নীতির মূলোৎপাটনে সমান্তরাল অর্থনীতিকে ধূলিসাৎ করতে নোটবন্দির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অনেক বিরোধী নেতা-নেত্রীর কায়েমি স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়াতে তাঁরা ভারতীয় অর্থনীতির মাইলফলক-স্বরূপ এই নোটবন্দির ঘটনাটিকে নিয়ে আজও ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করেন।

এবার আমেরিকান অর্থনৈতিক বিশ্লেষক সংস্থা বার্নস্টেইন-এর ৩১ পৃষ্ঠার রিপোর্ট 'দ্য ডিকেড আন্ডার পিএম মোদী: ডিপ ডাইভ'-এ উঠে এলো ভারতীয় অর্থনীতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জমানায় সমৃদ্ধতর হওয়ার কথা। প্রতিবেদন বলছে, মোদী সরকারের পরিশ্রমের ফলেই এই জিনিসটা সম্ভব হয়েছে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে প্রচুর বিনিয়োগ, পণ্য ও পরিষেবা করের ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার— সব মিলিয়ে নরেন্দ্র মোদীর আমলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নানা মাইলফলক বলে প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয়েছে। অর্থনৈতিক সংস্থাটির প্রতিবেদনে গুরুত্বের সঙ্গে বলা হয়েছে, মোদীর আমলে ডিজিটাল দুনিয়ায় ভারতের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত অর্থ-বিনিয়োগ করেছে সরকার। দেশে বিনিয়োগ আনার জন্য পরিবেশ-বিষয়ক আরও কার্যকরী নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তাতেই ভর করেই বিশ্বের দশম বৃহৎ অর্থনীতি থেকে পাঁচ ধাপ উপরে উঠে পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতি হয়ে উঠেছে ভারত। সেই সঙ্গে ওই সংস্থার রিপোর্টে এও দাবি করা হয়েছে, নেহাত ভাগ্যের জন্যে ভারতীয় অর্থনীতিতে গতি আসেনি। প্রতিবেদনে বিশেষভাবে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মোদী সরকারের পরিশ্রমের কারণে মাত্র ৯ বছরের মধ্যে আজকের জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় অর্থনীতি।

ওই সংস্থার দাবি অনুযায়ী, আর্থিক সংকটের মুখে থাকা একাধিক প্রতিষ্ঠান-সহ দুর্বল অর্থনীতিকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও একাধিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ভারতকে উন্নয়নের পথে নিয়ে গিয়েছে মোদী সরকার। যাতে দেশে আরও বেশি বিনিয়োগ টানা যায়, সেজন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকাঠামো (রেল, বন্দর, রাস্তা বা সড়ক, শক্তি ইত্যাদি) ক্ষেত্রে প্রচুর অঙ্কের আর্থিক বিনিয়োগ করেছে। অর্থনীতির ভিতকে আরও মজবুত করা হয়েছে বলে ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'রাতারাতি জীবন পালটে যেতে পারে— কারও কারও ক্ষেত্রে সেটা ভাগ্যের কারণে হয়, অধিকাংশের ক্ষেত্রে অনেক বছরের পরিশ্রমের ফলে সেটা হয়। ভারতীয় কাহিনিটা একইরকম।' আমেরিকান অর্থনৈতিক বিশ্লেষক সংস্থার রিপোর্টে আরও দাবি করা হয়েছে, মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার আগে কয়েক দশক ধরে অত্যন্ত ধীরগতিতে ভারতের অর্থনীতি এগিয়ে ক্ষমতায় এসে একের পর পর সংস্কারমূলক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মোদী সরকার ভারতের অর্থনীতিতে গতি এনেছে বলে দাবি করা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে, মোদী সরকারের আমলে অর্থনীতিতে যে ডিজিটাল বিপ্লবের সূচনা হয়েছে, তা আসলে ভারতের সাফল্যের প্রধানতম কারণ। তথ্য-পরিসংখ্যান উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে, ২০১১ সালে যেখানে ভারতের মোট জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল, তা ২০২১ সালে ৭৭ শতাংশের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে। সেটা সম্ভব হয়েছে ২০১৪ সালের একটি সিদ্ধান্তের কারণে। সেই বছর জনধন প্রকল্প চালু করার ফলে ভারতে ৫০ কোটি জনধন অ্যাকাউন্ট হয়েছিল।

তবে প্রতিবেদনে মোদী সরকারের প্রশংসার মাঝেও খামতিগুলিও তুলে ধরা হয়েছে। বার্নস্টেইনের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ২০১৬ সাল থেকে ভারতে মানব উন্নয়নের সূচক ক্রমশ কমছে। আর্থিক- দুর্নীতির সূচকও ইদানীং বেশ খারাপের দিকে। মাধ্যমিক স্তরের স্কুলে লিঙ্গ অনুপাত একের নীচে নেমে গিয়েছে। মেয়েদের সাক্ষরতার হার বাড়লেও বাস্তবে তেমন কিছু পরিবর্তন হয়নি। যদিও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মোদী সরকারের যে ব্যর্থতার কথা মার্কিন সংস্থার প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আর্থিক নীতির কারণে এই ব্যর্থতা যত না, তার থেকে অনেক বেশি রাজনৈতিক কারণে। যেমন আর্থিক দুর্নীতি রুখতে মোদী সরকার দায়বদ্ধ হলেও, ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যের শাসক দলের নেতা-মন্ত্রী থেকে তাদের অনুচরেরাও লাগামছাড়া আর্থিক দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এদের জন্যই ভারতীয় অর্থনীতিতে আজ যে জায়গায় থাকার কথা ছিল, সেই জায়গায় নেই। এদিকে চলতি মাসে এই প্রতিবেদন প্রকাশের মাসখানেক আগে গত ২ জুন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ নতুন দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে আশা প্রকাশ করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত বিশ্ব অর্থনীতিক মানচিত্রে এক উদ্ভূত শক্তি হিসেবে নয়, বরং এক পুনরুত্থিত শক্তি হিসেবে নিজের জায়গা ফিরে পাচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারত ছিল শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ। বিশ্বের সামগ্রিক উৎপাদনে এক-চতুর্থাংশেরই অংশীদারিত্ব ছিল ভারতের। কিন্তু দুর্বল সামরিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক দাসত্বের কারণে এই দেশ তার গরিমা হারায়। □

সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারত ছিল শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ। বিশ্বের সামগ্রিক উৎপাদনে এক-চতুর্থাংশেরই অংশীদারিত্ব ছিল ভারতের। কিন্তু দুর্বল সামরিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক দাসত্বের কারণে এই দেশ তার গরিমা হারায়।

নালন্দা থেকে মার্সাই একই ছবি

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

সোশ্যাল মিডিয়ায় ফ্রান্সের চলমান তাণ্ডবের অজস্র বিষাদময় ধ্বংসের ছবির মধ্যে মারাত্মক ছবি হলো মার্সাই শহরের বৃহত্তম সাধারণ গ্রন্থাগারে আগুন লাগানো। আগুনের শিখা সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে গ্রন্থাগারটিকে। জ্ঞান, সংস্কৃতি ও জাতীয় সম্পদের ক্ষতির প্রতীক হয়ে থাকবে এই ছবিটা। শহরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি এ এক নির্মম আঘাত। প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার বই পুড়েছে। ৮২০ বছর আগে নালন্দায় পুড়েছিল ১০ লক্ষ। এইসব বই থাকলে ইসলামের মুশকিল। (বিদ্যাসাগর রচনাবলী দ্রষ্টব্য)।

২৭ জুন প্যারিসের ট্র্যাফিকস্টপে নাহেল এক নামে আলজেরিয়া-মরক্কো জাতির ১৭ বছর বয়সি কিশোর পুলিশের গুলিতে মারা যাওয়ায় গোলমালের সূত্রপাত। দায়ী পুলিশ অফিসারকে ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধের অভিযোগে তদন্ত শুরু করা হলেও ৩০ জুন 'বিরল সহিংসতা'র রাত শুরু হয়। ফ্রান্স জুড়ে ছড়িয়ে পড়া দাঙ্গা মোকাবিলায় ৪৫০০০ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। ১ জুলাই রাতে মারমুখী আরব-মুসলমান জনতা চ্যাম্পস-এলিসিতে জড়ো হলে সশস্ত্র পুলিশের মুখোমুখি হয়। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও স্টান গ্রেনেড দিয়ে ঠেকালে বিক্ষোভকারীরা আতশবাজি ছোঁড়ে, ব্যারিকেড জ্বালিয়ে দেয়।

পুলিশ ২৪০০ জনকে আটক করেছে। ৩০৭ জন শুধু প্যারিসের। ২৫০০টি জায়াগায় আগুন লাগানো এবং অসংখ্য দোকান ভাঙচুর করা হয়েছিল। পুলিশের মতে প্রায় ২০০ পুলিশ কর্মকর্তা ও দমকলকর্মী আহত হয়েছেন। স্কুল, টাউন হল ও পুলিশ স্টেশনগুলোকে লক্ষ্য করে মুসলমানরা আগুন লাগিয়েছে। আক্রান্ত আতঙ্কিত বাসিন্দা ও দোকান মালিকরা পুলিশ মোতায়েনে খুশি।

প্রতিবেশী উপশহর কলম্বাসে বিক্ষোভকারীরা আবর্জনার ডোবা উলটে ফেলে অস্থায়ী ব্যারিকেড হিসেবে ব্যবহার করে। ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর শহর মার্সাইতে সন্ধ্যার সময় লুটেরারা একটা বন্দুকের দোকানে ঢুকে অস্ত্র লুট নিয়ে যায়। গ্রন্থাগার জ্বালায়। পূর্বাঞ্চলের লিয়তেও ভবন ও দোকান ভাঙচুর করা হয়েছে। প্রায় ৩০ জনকে গ্রেপ্তারের এক তৃতীয়াংশ চুরির জন্য দায়ী।

খুব অল্পবয়সি দাঙ্গাবাজরা ২ জুলাই ভোরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে রাত দেড়টায় লিপ্ত হয়ে জ্বলন্ত গাড়ি নিয়ে প্যারিসে শহরতলির মেয়রের বাড়ি ঢোকে। তার ঘুমন্ত স্ত্রী ও সন্তান হামলায় আহত হয়েছে। তখন তিনি টাউন হলে সহিংসতা মোকাবিলা করছিলেন। জানা গেছে গাড়িটা মেয়রের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মতলবে ছিল। গাড়ির মধ্যে ফ্লেম অ্যাক্সিলারেন্ট পাওয়া গেছে।

ফরাসি গায়ানাতে ৫৪ বছরের একজন বিক্ষিপ্ত বুলেটের আঘাতে মারা গেছেন। জাতীয় স্টেডিয়ামে কনসার্ট এবং দেশজুড়ে ছোটো ছোটো ইভেন্ট বাতিল করা হয়েছে। ফ্রান্সের অন্যান্য অংশে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ছিল। সরকার ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করে আইন বলবৎ প্রক্রিয়া বাড়িয়েছে, অনেককে ছুটি থেকে ফিরে আসতে বলা হয়েছে।

ভিডিয়োতে দুই আধিকারিককে নিহতের গাড়ির জানালার কাছে দেখা গেছে, একজন তার বন্দুক চালকের দিকে তাক করছে। চালক কিশোর এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অফিসার উইন্ডশিল্ড দিয়ে একবার গুলি চালায়। পাবলিক প্রসিকিউটর জানিয়েছেন যে সেই অফিসারের উদ্দেশ্য ছিল একটা নিশ্চিত আসন্ন কারচেজ থামানো, তার থেকে ওই অফিসার ও অন্য আরও অনেকের মৃত্যু হতো।

> **ইউরোপ! রোহিঙ্গা নিয়ে ভারতকে অনেক জ্ঞান দিয়েছ, এইবার বোঝো! ভারতের কংগ্রেস-কমিউনিস্ট-লিবারাল- সেকুলারা এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেবেন কি?**

২০০৫ সালেও ফ্রান্স কয়েক সপ্তাহের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পালিয়ে যাওয়ার সময় প্যারিসের শহরতলির ক্লিচি-সুস-বোইসের এক পাওয়ার সাবস্টেশনে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে দুই কিশোরের মৃত্যু হওয়ায় টাউন হল, একটি হাই স্কুল, লাইব্রেরি এবং একটি সুপারমার্কেট-সহ সেখানে বেশ কয়েকটি ভবনে আগুন লাগানো হয়েছিল।

ক্লিচির পরিবহণ কর্মী সাম্বা সেক বলেছেন, 'নাহেলের গল্প হলো সেই লাইটার বা গ্যাস জ্বালানো। আশাহত তরুণরা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। আমাদের আবাসন, চাকরির অভাব রয়েছে, চাকরি থাকলেও মজুরি খুব কম'। ক্লিচির ১৫ বছরের মুসার বলেছে, 'যে পুলিশ অফিসার নাহেলকে মেরেছে তাকে আমি ঘৃণা করি। সে তাকে খুন করতে চেয়েছিল। ২০০৫ সালে জায়েদ, বাউনাকে মারা হয়েছিল তখন ভিডিয়ো, সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না। আজ আমরা সবাই দেখেছি কী ঘটেছে।'

উত্তর আফ্রিকার আরবি খেলোয়াড়রা বিবৃতিতে বলেছেন, 'তরুণরা সবকিছু ভেঙে ফেলেছে বটে, তবে মানতে হবে আমরা দরিদ্র, আমাদের কিছুই নেই। তরুণরা পুলিশের হাতে মারা যাওয়ার ভয় পায়। আমাদের মধ্যে অনেকেই শ্রমিক-এলাকার, আমরাও নাহেলের হত্যার জন্য ব্যথা ও দুঃখ ভাগ করি'।

জানা গিয়েছে, নাহেল বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল যুবক ছিল। একটা জায়গায় ইলেকট্রিকের কাজ করার জন্য ভর্তি হয়েছিল কিন্তু সেখানেও সে অনিয়মিত। সে ও তার বন্ধুরা প্রায় ট্র্যাফিক আইন ভঙ্গ করে পাবলিক নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটায়। ৫ জুলাই হায়দরাবাদে চারজন মুসলমান যুবক অস্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালিয়ে দুইজন মহিলাকে তৎক্ষণাৎ নিহত ও একজনকে আহত করে কিন্তু নিজেরা গাড়ির সেফটি বেলুনে বেঁচে যায়। কলকাতাতেও এক বিশেষ সম্প্রদায়ের

ফঃ ২

দ্বিচক্রযান চালক সর্বদা ট্র্যাফিক আইন ভঙ্গ করে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায় যদি পুলিশের হয় তবে তার হাতে যথেষ্ট নিবৃত্তিমূলক ক্ষমতা প্রদান করতে হয় নাহলে ভাবের ঘরে চুরি করা হয়। আর, একটা হত্যার বদলা যদি এই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করা হয় তবে গোটা পৃথিবীটাই একদিন খতম করার দাবি উঠবে স্বাভাবিকভাবে। আসলে নাহেল হত্যার বদলা একটা ছুতো। গণ্ডগোল ওরা করতই। এই দাঙ্গার জেনেসিসটা জানা দরকার।

ফ্রান্সের ঘটনা পুরো ইউরোপের একটা টেন্ডার বক্স। মরক্কো ফুটবলে বেলজিয়ামকে হারিয়েছিল। তারা উদ্‌যাপন করেছিল বেলজিয়ামের লোকদের দৈহিক আক্রমণ করে! আরব দেশ থেকে ইউরোপে মুসলমান অভিবাসন অনেকদিন থেকে চলছে কিন্তু ২০১১-১২ সাল থেকে তা বিপুল বৃদ্ধি পায়, এর পিছনে ছিল আরব-বসন্ত। আর তাকে বৃহৎ পরিমাণে তোল্লাই দিয়েছিল ওবামা প্রশাসন। আরব-বসন্ত মানে একনায়কতন্ত্র খতম করো, গণতন্ত্র আনো, নাগরিক বিক্ষোভ শুরু করো। উত্তর আফ্রিকা জাতিগতভাবে মূলত আরব। সেখানে গণবিক্ষোভ শুরু করা হয় আরব-বসন্ত নাম দিয়ে। আবার সিরিয়া-ইরাক, ইয়েমেনে শুরু করা হয় গৃহযুদ্ধ! এই সব দেশে এমন হাল করেছিল যে লোকে ওখানে থাকতে পারছিল না। তারা ঠিক করল দেশ ছেড়ে পালাবে।

কিন্তু সৌদি আরব, কুয়েত, কাতারের মতো সমৃদ্ধ মুসলমান দেশগুলো তাদের আশ্রয় দিল না। তখন ওরা ঠিক করল ইউরোপে আশ্রয় নেবে। কিন্তু পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো যেমন পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, চেক রিপাব্লিক জায়গা দিল না। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপ 'লিবারেল'! তারা আশ্রয় দিল। এর ফলে পশ্চিম ইউরোপে ডেমোগ্র্যাফিক চেঞ্জ দেখা গেল। এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হলো পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর ফুটবল দল। সেখানে সাদা চামড়ার ফুটবলার নেই বললেই চলে।

এটা ধীরে ধীরে হচ্ছিল। একজন নিষেধ করেছিল—কমরেড গদ্দাফী। তাকে মেরে দেওয়া হলো, কারণ সেখানে গণতন্ত্র আনতে হবে। আজ লিবিয়াতে গণতন্ত্র নেই, গৃহযুদ্ধ চলছে। সিরিয়াতেও গৃহযুদ্ধ চলছে। লিবিয়ার গদ্দাফি, সিরিয়ার বাসার-আল-আসাদ আল কায়েদার মতো জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়ছিল। মিশরে সন্ত্রাসী মুসলিম ব্রাদারহুডকে বসানো হয়। একটা আইনি-পরিবর্তন আনা হচ্ছিল। মিশরের ক্ষমতাশালী, রাজনীতি সচেতন সামরিক বাহিনী সেই সরকার ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কাজেই তারা বাঁচল না। এর ফলে ইউরোপে একটা ট্রোজান হর্সের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, ঘটছে। এটাই খেলার প্রথম ধাপ। এইভাবে ইউরোপের পতন শুরু। আরব দেশগুলোতে শান্তি নেই। শুধু সৌদি আরব, কুয়েত ও কাতারে শান্তি আছে, খুব শক্তিশালী সরকার থাকায় আরব-বসন্ত হয়নি। ইউরোপে ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ এতটাই হয়েছে যে সেখানকার আরব মুসলিম উদ্বাস্তুরা যে কোনো সময়ে দাঙ্গা লাগাতে পারে। তারা গোটা দেশকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে। ওবামা ও সোরোসের এনজিও মিলে একটা গ্ল্যামারাইজড রায়টিং চালু করেছিল। মানে তুমি যদি দাঙ্গা করো তাহলে তুমি রাতারাতি খ্যাতি পাবে। ওবামার সময়ে এটা খুব বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যায়। পশ্চিম ইউরোপ বলে আমরা লিবারেল, এসো, আমাদের দেশে এসো, কারণ ওদের মধ্যে ঔপনিবেশিকতার অতীত ইতিহাসের কারণে একটা অপরাধবোধ কাজ করে। এইসব উদ্বাস্তুরা নিজের দেশকে বরবাদ করেছে। জাহাজ ভর্তি করে ইউরোপে এসেছে। কিন্তু এরা সভ্য হয়নি। সেইসব দেশের সংস্কৃতিকে আপন করেনি। ওরা ততক্ষণ চুপ থাকবে যতক্ষণ ওদের হাতে অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাবে। কিন্তু সেখানেও গোলমাল লাগে। অন্তিম লক্ষ্য ইউরোপ দখল। সব কিছু এই লক্ষ্যে হচ্ছে। সিরিয়াতে আমেরিকা এঁটে উঠতে পারেনি, কারণ রাশিয়া ঢুকে পড়েছিল সেই রণাঙ্গনে। তাই রাশিয়াকে প্যাঁচে ফেলতে এই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ।

যতদিন পয়সা ততক্ষণ সব ঠিক আছে। সবাই মুসলমান নয় যেমন ক্যামেরুন, আইভরি কোস্ট, কিন্তু তারা পূর্বতন উপনিবেশবাদীদের পছন্দ করে না। ইউরোপ কৌশলগত নিরাপত্তার জন্য আমেরিকার উপর নির্ভর করে, নির্মাণ ও ব্যবসার জন্য চীন এবং জ্বালানি তেলের (৬০-৭০ শতাংশ) জন্য রাশিয়া। এই তেল সরবরাহের পাইপলাইন ধ্বংস করা হলো। রাশিয়ার উপর স্যাংশন জারী করতে ইউরোপের বিদ্যুতের দাম ১০ গুণ হয়ে গেল। কোথা থেকে এই রিফিউজিদের খাওয়াবে?

আরব স্প্রিংয়ের সময়ে তো ইউরোপ-আমেরিকা আরবদের বলেছিল নাগরিক অশান্তি তৈরি করতে, পয়সাও ওরাই দিয়েছিল। তাদের সেই গণবিক্ষোভকে তারা গ্ল্যামারাইজ করেছিল। এখন সেই জিনিসই তারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে করছে। কেন এখন তারা শুনবে? আর এইসব আলজিরিয়া, মরক্কোর লোকেরা ফ্রান্সের হয়ে খেললেও তাদের (যেমন জিদান, এমবাপে) জাতীয়তা ছাড়তে পারেনি। জাতীয়তা ছাড়া এত সোজা না, যতই কমিউনিস্টরা বলুক। সাদা-কালো লড়াই শুধু নয়, সাদায়-সাদায় লড়াইও বটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপের দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে হয়েছিল। স্কটরা ইংরেজদের পছন্দ করে না। ক্যাটালোনিয়া স্পেন থেকে আলাদা হতে চায়। এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথা চাড়া দেবে। রাশিয়া, ইউক্রেন তো মূলত ইউরোপের দেশ। ইউরোপীয় সংস্কৃতির মুখোশ পরে আসলে এরা লুটেরা। নিজেদের মধ্যে শতকের পর শতক লড়েছে, এশিয়া-আফ্রিকার সম্পদ লুটের জন্য নিজেদের মধ্যে লড়েছে। বিশ্বযুদ্ধ তার ফসল। ইউরোপে রিসেশন শুরু হয়েছে আর যখন নাজেহাল অবস্থা হবে তখন হোয়াইট-সুপ্রিম্যাসি দেখা দেবে, হিটলারের জন্ম হবে।

অর্থনৈতিক যুদ্ধ চলছে। ছোটো ছোটো দেশ সাবসিডি দিতে পারছে না। জার্মানি সবচেয়ে সমৃদ্ধ তাই দিচ্ছে শক্তি ব্যয় ১০ গুণ হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু তারা একা চিরকাল সাবসিডি দেবে না। জার্মানির দ্রব্য কিনবে কে? রাশিয়া ও চীন বড়ো ক্রেতা। রাশিয়ার উপর ইকনমিক স্যাংশন, তাই কিনতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত জার্মানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বলবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাব। আমেরিকা এটাই চাইছিল ওবামার নেতৃত্বে। ট্রাম্প কিছুটা আটকেছিল, তাকে সরানো হলো। আমেরিকা নিজের উপকূলের থেকে দূরে অশান্তি পাকায়। ন্যাটো তৈরির অন্যতম উদ্দেশ্য রাশিয়াকে আটকানো। আর আমেরিকার নেতৃত্বে ন্যাটো ইউক্রেনকে সদস্য বানানোর বন্দোবস্ত করছিল রাশিয়াকে ব্যতিব্যস্ত রাখতে। রাশিয়া ফাঁদে জড়িয়ে ইউক্রেন আক্রমণ করে ডুবছে। ইউরোপে ঝামেলা মানে আমেরিকার অস্ত্র বিক্রি। কিন্তু লাভবান হচ্ছে ইসলাম। তাদের ইউরোপ দখল অনেকটা করায়ত্ত।

ইউরোপ! রোহিঙ্গা নিয়ে ভারতকে অনেক জ্ঞান দিয়েছ, এইবার বোঝো! ভারতের কংগ্রেস-কমিউনিস্ট-লিবারাল-সেকুলাররা এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেবেন কি? ◘

নির্বাচনের নামে পশ্চিমবঙ্গের রক্তস্নান

মণীন্দ্রনাথ সাহা

পঞ্চায়েত ভোট ঘিরে রাজ্য জুড়ে আবার অশান্তির আগুন যেভাবে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে তা শুরু গ্রামবাঙ্গলার বিভিন্ন স্তরে ৭৪হাজার-এরও বেশি প্রতিনিধির জন্য ৮ জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে। ৮ জুনের পর থেকে ১১ জুলাই অর্থাৎ ভোট গণনার দিন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫০ জনের। নির্বাচনে এইরকম হিংসা ছড়িয়ে পড়া অত্যন্ত নজিরবিহীন ও ন্যাক্কারজনক। শাসকবাহিনী যেভাবে খুল্লামখুল্লা ছাপ্পা ভোট, বুথ জ্যাম, ব্যালটবক্স, ব্যালট পেপার ছিনতাই করেছে, পুড়িয়ে দিয়েছে, জলে ফেলে দিয়েছে তা এর আগে দেখা যায়নি।

রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন গত ৮ জুলাই শেষ হয়েছে এবং তার ফল প্রকাশ শুরু হয়েছে ১১ জুলাই। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত যে খবর পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে— জেলা পরিষদে ৯২৮টি আসনের মধ্যে ঘোষিত ফলে তৃণমূল-৮৩৫, বিজেপি-২৬ এবং অন্যান্যরা-১৫।

পঞ্চায়েত সমিতিতে ৯,৭২৮টি আসনের মধ্যে ঘোষিত ফলে তৃণমূল- ৬৭১৬, বিজেপি-২০৪৪, সিপিএম-১৯২, কংগ্রেস-২১২ এবং অন্যান্যরা-২৯৪।

গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬৩,২২২ আসনের মধ্যে তৃণমূল-৩৫৬০৬, বিজেপি-৯৮৮৯, সিপিএম-২৯৯৯, কংগ্রেস-২৫১৪ এবং অন্যান্যরা ৩০৮৭টি আসন পেয়েছে। এই ফলাফল কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারাধীন।

এবারের নির্বাচনে অভূতপূর্ব অভিযোগগুলি ছিল বিরোধী দলের নমিনেশনে কারচুপি, নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে অন্যায়ভাবে ৮২ জনের নাম বাতিল করে শাসকদলকে জিতিয়ে দেওয়া, সৌদি আরবে হজ করতে যাওয়া ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেওয়া, মনোনয়নপত্রের সঙ্গে বি-ফর্ম ছিনিয়ে নিয়ে নমিনেশন বাতিল করা ইত্যাদি।

এ রাজ্যে ভোটের সময় হিংসা শুধু এবারেই নয়, ১৯৭২ সালে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের হাতে পুষ্ট নব কংগ্রেসের হাত ধরেই হিংসার রাজনীতি আমদানি হয়েছে এ রাজ্যে। পরে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট তার যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে ভোট প্রক্রিয়াকে রক্তস্নাত করেছে। রাজ্যের বর্তমান শাসকদলও সেই ট্র্যাডিশন বজায় রেখে বিজেপি-সহ বিরোধীদের নিকেশ করতে উদ্যত হয়েছে। ২০০৩ ও ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের স্মৃতি এখনও দগদগে

ঘায়ের মতো জেগে আছে। শাসকদলের সন্ত্রাসে সেবারও বহু নির্দোষ মানুষের প্রাণ অকালে ঝরে গিয়েছিল। এখন পরিবর্তনের নামে শাসকদল সেভাবে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে, তাতে পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে এ রাজ্যে শাসকদলের চোখ রাঙানিতে বিডিও থেকে ডিএম সবাই ভোট লুটের সঙ্গে যুক্ত থাকতে বাধ্য হয়। বিগত দিনেও দেখা গেছে নির্বাচনপর্ব শুরু হলে মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যেই নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে নির্বাচনের পরে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে লোক খেপানোর কাজ করেন তা এক কথায় নজিরবিহীন। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘিরে ফেলার ডাক দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রসঙ্গ আসতেই তিনি আবার সেই একই কথা বলেন।

যে রাজ্যে শান্তিতে অবাধে গণতন্ত্রের উৎসব পালিত হতে পারে না, যেখানে অবাধ সন্ত্রাসে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনারের প্রচ্ছন্ন মদত চলে, সেখানে তো প্রশ্ন উঠবে আইনশৃঙ্খলা কোথায়? তাহলে কেন কেন্দ্র সরকার ৩৫৬ ধারা জারি করবে না? পশ্চিমবঙ্গে যদি অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন করতে হয়, তাহলে তার একমাত্র সমাধান রাষ্ট্রপতি শাসনে ভোট হওয়া। এ রাজ্যের প্রত্যেকটি নাগরিক ও প্রতিটি দলের উচিত রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার দাবি তোলা।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব ছিল মানুষের নির্বিঘ্নে ভোট দানের ব্যবস্থা করা। তিনি সেই কাজে সঠিক ভূমিকা নেননি। যদি নিতেন, তাহলে এত মানুষের বীভৎস মৃত্যু আদৌ সংগঠিত হতো না। যে সমস্ত মা তাঁদের সন্তান হারালেন, যে সমস্ত স্ত্রী স্বামীহারা হলেন, যাঁরা ভ্রাতৃহীন হলেন, যে সমস্ত সন্তান পিতৃহীন হলেন তাদের অপূরণীয় ক্ষতিসাধনের জন্য যারা দায়ী, আগামীদিনে তাদের উপযুক্ত শাস্তি হবে তো? নাকি 'যথোপযুক্ত' ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুরস্কৃত হবেন?

সকলের আশঙ্কা সত্যি প্রমাণ করে সারা রাজ্যে চলল ব্যাপক ভোট সন্ত্রাস। অসহায় মহিলা প্রিসাইডিং অফিসারদের নিযুক্ত করা হলো, অথচ তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করল না নির্বাচন কমিশন। তাঁদের সামনে যেভাবে ভোট লুট হয়েছে, তা দেখে একজন মহিলা প্রিসাইডিং অফিসার কেঁদে ফেলেন। রাজ্যজুড়ে ব্যাপক হিংসা, অগ্নিসংযোগ, ব্যালটবক্স জলে ফেলে দেওয়া, ব্যালট পেপার জ্বালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাণ্ড নির্বিঘ্নে করেছে শাসকের পোষিত গুন্ডারা। সন্ত্রাস হয়েছে— কোচবিহার, ইসলামপুরে, মালদায়, ডোমকলে, বাঁকুড়ায়, আসানসোলে, ভাঙড়ে, হেমতাবাদে, মথুরাপুর-সহ বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন স্থানে।

নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা দায়িত্ব নেওয়ার পরদিন থেকে ভোটের ফল প্রকাশের দিন পর্যন্ত মৃত্যু মিছিল চলেছে। তার দায় কার? কে নেবে এর দায়িত্ব? নির্বাচন কমিশনারের ব্যর্থতায় যে এতগুলো প্রাণ চলে গেল, তারজন্য তার বিরুদ্ধে এফআইআর করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। খুনি, রক্তপিপাসু, ভোট লুটের রাজা নির্বাচন কমিশনারের ফাঁসির দাবি উঠুক। এই ভোট মনে করিয়ে দিল একটি কবিতার যা এবারের ভোটের নিরিখে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক— 'আজও আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই, আজও আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ননৃত্য দেখি, ধর্ষিতার কাতর চিৎকার শুনি আজও আমি তন্দ্রার ভেতরে...।

হিংসার এই বীভৎসতার ঐতিহাসিক কারণ লুকিয়ে আছে শাসকদলের এক বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর উদ্ধৃতির মধ্যে। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন— 'এত চোর, ধান্দাবাজ দলে থাকতে পারে, তা জানা ছিল না। তাই কী করব, কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। জানা ছিল না সেই চোর ধান্দাবাজগুলো বড়ো বড়ো নেতাদের এত প্রিয়।' ভাবতে পারছেন, শাসকদলের এক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির এই স্বাভাবিক স্বীকারোক্তি! বঙ্গ রাজনীতির হেজে যাওয়া, গলে যাওয়া, পচে যাওয়া অবস্থাকে ব্যাখ্যা করার এ এক ঐতিহাসিক দলিল হয়ে থাকবে।

রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটে যে ব্যাপক হিংসা হলো তার দায় কিন্তু একা নির্বাচন কমিশনের নয়। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সঙ্গে এর দায় বর্তায়— মহামহিম রাজ্যপালের, মহামান্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ওপরও। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তরও দায় এড়াতে পারে না। কেননা রাজ্যপাল শুধু বড়ো বড়ো কথা বলেছেন। কাজের কাজ তেমন কিছু করেননি। হাইকোর্টের মহামান্য প্রধান বিচারপতি তাঁর প্রতিটি রায়ে কড়া নির্দেশ না দিয়ে অস্পষ্ট কথা বলেছেন। আর কেন্দ্র সরকার। বাহিনী পাঠানো নিয়ে অনেক দেরি করে ফেলেছে। ২১-এর নির্বাচন পরবর্তী হিংসা দেখেও কেন্দ্র কেন কড়া ব্যবস্থা নেয়নি? এত সন্ত্রাস এবং অবৈধ কার্যকলাপ দেখেও কেন্দ্রের ঘুম ভাঙেনি?

রাজ্যজুড়ে ভোটের নামে রক্তের হোলি খেলা চললো! তখন বঙ্গ বুদ্ধিজীবীরা কোথায় ছিলেন? এইভাবে মেরুদণ্ড বন্ধক রাখলে আগামী দিনে শুধু আমেরিকা কেন আমতলাতেও অপমানিত হবেন, নিগৃহীত হবেন। সামনেই 'ইউনিফর্ম সিভিল কোড' আসছে, তখন তার প্রতিবাদে রাস্তায় নামলে মানুষ আপনাদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়লে, থুতু ছিটালে, কালো পতাকা আপনাদেরকে উপহার দিলে তাদের কি খুব দোষ দেওয়া যাবে? আরও মনে রাখবেন। বাংলাদেশের মহম্মদ শহীদুল্লা সাহেব বহুদিন আগে আপনাদের সম্পর্কে যে কথা বলে গেছেন— 'বেশ্যাকে তবু বিশ্বাস করা চলে, বুদ্ধিজীবীদের রক্তে স্নায়ুতে সচেতন অপরাধ।' আজ তার প্রমাণ দিচ্ছেন বঙ্গ বুদ্ধিজীবীরা নিজেরাই।

গ্রামীণ অর্থনীতির বণ্টন ব্যবস্থার অঙ্গস্বরূপ পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আমাদের ঢেলে সাজাতে হবে। রাজনৈতিক নেতাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, পঞ্চায়েত হলো মধুভাণ্ড। সমস্ত সরকারি টাকা হলো লুটের মাল। যেমন— সড়ক যোজনা, আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজ, গ্রামীণ রোজগার যোজনা এবং আরও অনেক প্রকল্পের দিকে পঞ্চায়েতের সদস্যরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। একবার পঞ্চায়েত দখল করলেই কেল্লা ফতে। তারা মনে করেন পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার সুযোগে যেন তার অধস্তন চোদ্দ পুরুষের জন্য আর কোনো চিন্তা করতে না হয়। তাই জনপ্রতিনিধিত্বের রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে যে ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তা হলো— পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন হলো— শুধুমাত্র মানুষের সেবা করার একটা মাধ্যমমাত্র। □

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি সব বাধা কাটিয়ে সারা দেশে চালু হতে চলেছে

ড. বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়

বর্তমানে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ নিয়ে দেশ জুড়ে হইচই চলছে। এই নীতি করোনাকালীন দুই বছরে স্বাভাবিক কারণেই প্রচারের আলোয় আসেনি। করোনা শেষে এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয় এবং অনেক রাজ্য এই ব্যাপারে কাজ শুরু করে। যথারীতি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এই ব্যাপারে নিশ্চুপ ছিল। এখন বিভিন্ন রাজ্য এই নীতি প্রণয়নে তৎপর হওয়ায় আমাদের রাজ্য গাঝাড়া দিয়ে উঠে এর রূপায়ণে অগ্রসর হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে যাবার আগে আমরা আমাদের দেশে বিভিন্ন সময় প্রণীত উল্লেখযোগ্য শিক্ষানীতিগুলির একটু ইতিহাস জেনে নিই। ভারতে প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল স্যার উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে ১৮৮২ সালে যা হান্টার শিক্ষা কমিশন বা সংক্ষেপে, হান্টার কমিশন নামে পরিচিত ছিল যদিও এর সরকারি নাম দেওয়া হয়েছিল ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন, ১৮৮২। এর অনেক আগে ১৮৩৫ সালে অবশ্য জারি হয়েছিল মেকলে মিনিট যা সমগ্র ভারতে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা প্রবর্তন করে, যাতে দেশবাসীদের দিয়ে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে করণিকের কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। ১৮৫৪ সালের মেকলে কমিশন ভারতবাসীর কাছে সিভিল সার্ভিসের দরজা খুলে দেয়।

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন হলো ১৯৪৮-এর রাধাকৃষ্ণন কমিশন যা ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশন নামে পরিচিত এবং যার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্কুল শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষার মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করা এবং সেই উদ্দেশ্যে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস্ কমিশন (ইউজিসি) নামক একটি সংস্থা স্থাপনের বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ করা। এর ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর ইউজিসি প্রতিষ্ঠিত হয় যা দেশের সমগ্র

উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্রমশ নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এরপর আসে ১৯৫৩-এর মুদালিয়ার কমিশন যা সেকেন্ডারি এডুকেশন কমিশন নামে পরিচিত ছিল কারণ এই কমিশন একদিকে যেমন প্রাথমিক-পরবর্তী স্কুল শিক্ষার জন্য ১১ থেকে ১৭ এই ৭ বছর সময়কাল নির্দিষ্ট করে, তেমনি স্কুলস্তরে কর্মশিক্ষার প্রচলন করে এবং কৃষি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ১৯৬৪-৬৫ সালের কোঠারি কমিশন দেশে স্কুল শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ত্রিভাষা সূত্রের প্রচলন করে যার অর্থ হলো মাতৃভাষার পাশাপাশি হিন্দি ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা এবং সঙ্গে থাকবে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাও। এর ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষা নীতি, ১৯৬৮ প্রণীত হয়।

এরপর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষানীতি আসে রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ১৯৮৬ সালে যা শিক্ষার উপর কেন্দ্রীয় নীতি (ন্যাশনাল পলিসি অন এডুকেশন, ১৯৮৬) নামে পরিচিত। এই নীতি সর্বভারতীয় স্তরে স্কুলে শিক্ষায় কম্পিউটার ভিত্তিক আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা করে এবং দেশজুড়ে থাকা প্রায় ৬০০ জেলায় একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের কথা বলে যার পোশাকি নাম হলো জওহর নবোদয় বিদ্যালয়। বর্তমানে দেশের প্রায় ১৫০০০ ব্লকে এই নবোদয় স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামের মেধাবী শিশুদের আধুনিক ও উৎকর্ষ শিক্ষার আওতায় আনার প্রচেষ্টা চলেছে। ২০০২ সালে বাজপেয়ীজীর নেতৃত্বে প্রথম এনডিএ সরকার ৬ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত শিশুদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের কথা বলে এবং এটিকে সংবিধানের ২১-এ ধারার অধীন শিশুদের মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে যা নিঃসন্দেহে ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। রাজীব গান্ধীর সরকার প্রণীত শিক্ষানীতির ৩৪ বছর পর আমরা পেলাম মোদীজীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি তথা তৃতীয় এনডিএ সরকারের নয়া শিক্ষা নীতি যা আইএসআরও-র প্রাক্তন প্রধান কস্তুরীরঙ্গনের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রায় পাঁচ বছরের প্রচেষ্টায় ও শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের প্রভূত শিক্ষাবিদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে একটি খসড়া প্রস্তুত করে যা এযাবৎ চালু হওয়া সমস্ত শিক্ষা নীতির থেকে ধারে, ভারে এবং ব্যাপকতায় অভিনব, কারণ একসঙ্গে সমস্ত স্তরের শিক্ষাক্রমের বাস্তবমুখী ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের প্রস্তাব এতে দেওয়া হয়েছে। এই নতুন শিক্ষানীতিতে শিক্ষার অধিকারের আওতায় আনা হচ্ছে ৩ থেকে ১৮ বছরের শিক্ষার্থীদের। এর সঙ্গে ব্যাপক বদল আনা হচ্ছে শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা ব্যবস্থায়। উদ্দেশ্য হলো ২০৩৫ সালের মধ্যে স্কুল স্তরে মোট তালিকাভুক্তির অনুপাত (enrolment ratio) ৫০ শতাংশে উন্নীত করা। এর জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্কুলস্তরে প্রবেশযোগ্যতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রের মোদী সরকারের নতুন শিক্ষানীতি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে চলতি বছরে চালু হতে চলেছে। এর পরিচিতি নিউ এডুকেশন পলিসি, ২০২০ বা এনইপি ২০২০ নামে। ২০২০ সালে করোনা শুরুর ঠিক আগে এটি প্রকাশিত হওয়ার পরও এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলেছে। কিন্তু আলাপ আলোচনার তো একটা

শেষ আছে, এক সময় তার রূপায়ণ শুরু করতে হয়, কারণ রূপায়ণকালেও ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিলে তার সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যথারীতি আমাদের রাজ্যের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই এটি নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু না করায় সর্বভারতীয় স্তরে এর রূপায়ণ বিষয়ে পিছিয়ে পড়েছে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা অসুবিধায় পড়তে পারে ভেবে এই রাজ্যের শিক্ষার কাণ্ডারিরা নতুন শিক্ষানীতির রূপায়ণে অগ্রসর হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা পাঠ্যক্রম চলতি বছর, অর্থাৎ ২০২৩-২৪-এ দেশজুড়ে চালু হতে চলেছে যদিও স্কুল শিক্ষা পাঠ্যক্রম স্কুল স্তরে অনেক পরিকাঠামোজনিত পরিবর্তন সাপেক্ষ বলে তা চালু করতে সম্ভবত ২০৩০ সাল হয়ে যাবে। তবুও আমরা উভয় স্তরে প্রস্তাবিত মূল বিষয়গুলিকে আলোচনায় নিয়ে আসছি। প্রথমেই বলে রাখি নতুন শিক্ষা নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক হবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক।

এনইপি ২০২০-র অধীন স্কুল শিক্ষা পাঠ্যক্রমে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনব ব্যবস্থাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন— (১) স্কুল পাঠ্যক্রমকে চলতি ১০ + ২ এই ১২ বছরের বদলে ৫+৩+৩+৪ এই ১৫ বছরে ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ একটি শিশু ৩ বছরে স্কুলে ভর্তি হয়ে ১৫ বছর কাটিয়ে ১৮ বছর বয়সে স্কুল ত্যাগ করবে। এর অর্থ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আরও ৩ বছর যোগ করা হয়েছে। প্রথম ৫ বছরের পর্বকে বলা হয়েছে মৌলিক স্তর (fundamental stage), দ্বিতীয় ৩ বছরের পূর্বকে বলা হয়েছে প্রস্তুতি স্তর (Preparatory stage), তৃতীয় ৩ বছরের পর্বকে বলা হয়েছে মাধ্যমিক স্তর (medium stage) এবং শেষ ৪ বছরের পর্বকে বলা হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (higher secondary stage)।

উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে স্কুল শিক্ষার্থীদের অলরাউন্ড করা এবং তার জন্য স্কুলজীবনে উদীয়মান পাঠ্যক্রমিক, পাঠ্যক্রম বহির্ভূত এবং সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। একটি শিশুর জন্মানোর পর এবং স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে বাড়িতে তিন বছরের প্রি-স্কুল পড়াশোনার সুপারিশও করা হয়েছে, অর্থাৎ সব শিশু এক অভিন্ন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে স্কুলে ভর্তির প্রস্তুতি নেবে। এর জন্য সারা দেশে একটি Activity & Learning Based Education Policy তৈরি হবে বলে জানানো হয়েছে।

(২) নতুন শিক্ষানীতির লক্ষ্য হলো বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুকে ন্যূনতম করা এবং বিশ্লেষণাত্মক ও সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা এবং সৃজনশীলতার উপর গুরুত্ব দেওয়া বা focus করা।

(৩) স্কুল শিক্ষায় বড়ো পরিবর্তন আসছে বর্তমানের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠদানের পদ্ধতিতে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় দশম শ্রেণী পাশ করার পর বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য— এই তিন বিভাগে ভাগ হয়ে যায় পড়াশোনার বিষয়সমূহ। নতুন শিক্ষানীতিতে এই বিভাগগুলি উঠে যাবে।

(৪) পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা ঐচ্ছিক হিসেবে ধরা হবে।

(৫) প্রতি বছরের বদলে তৃতীয়, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

(৬) নতুন শিক্ষানীতিতে গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষা। এইসব পরীক্ষায় এখন পড়ুয়াদের মুখস্থ বিদ্যার বদলে হাতে-কলমে শিক্ষায় জোর দিতে হবে। পড়ুয়াদের উপর চাপ কমানোর জন্য দু' ভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে— objective এবং Descriptive। বছরে দু' বার বোর্ড পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের প্রায়োগিক দিকের উপর ভিত্তি করে বোর্ডের পরীক্ষা নেওয়া হবে। দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ডের পরীক্ষায় ৮টি সেমিস্টারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতি অনুসারে মার্কশিটে শুধুমাত্র নম্বর এবং পরিসংখ্যানের পরিবর্তে প্রাধান্য পাবে পড়ুয়ার দক্ষতা ও যোগ্যতার বিষয়টি।

(৭) ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে বৃত্তিমূলক শিক্ষা (vocational course)। দশম শ্রেণীর পর কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের তফাত উঠে যাচ্ছে। যেমন কেউ পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়লেও তার ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে থাকতে পারে সংগীত। কেউ রসায়ন নিয়ে পড়লেও থাকবে ফ্যাশন ডিজাইনিং পড়ার সুযোগ। এতে স্কুল শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি অন্য নানা বিষয়ে আগ্রহ মেটাবার সুযোগ যেমন তৈরি হবে, তেমনি স্কুলের বাইরে এইসব বিষয়ে ব্যক্তিগত স্তরে প্রশিক্ষণ নেওয়ার বা শেখার চাপ কমে যাবে বা প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। এতদিন খরচ সাপেক্ষ এইসব প্রশিক্ষণ নিতে পারতো ধনীর ঘরের সন্তানরাই। এখন স্কুলে এইসব প্রশিক্ষণ শুরু হলে তা সবার জন্যই উন্মুক্ত হবে। এই কারণে স্কুলগুলিতে নানা বিষয়ের প্রচুর শিক্ষক শিক্ষিকার প্রয়োজন হবে বলে বেকার সমস্যা নিশ্চিতভাবেই কমবে।

এরপর উচ্চশিক্ষা বিষয়ে পরিবর্তনগুলি দেখা যাক। (১) স্নাতক স্তরে অনার্স কোর্স ৪ বছর পর্যন্ত হতে পারে। তবে প্রতি বছরের শেষে পড়ুয়ারা পেতে পারে সার্টিফিকেট। (২) উচ্চ শিক্ষাতে যে বড়োসড়ো রদবদলের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো স্নাতক স্তরে multiple entry and exit system চালু করা। (৩) একইভাবে স্নাতকোত্তর ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। সেখানে কেউ গবেষণা করতে চাইলে ৪ বছরের degree course করে ১ বছরের স্নাতকোত্তর বা ৩ বছরের degree course করে ২ বছর স্নাতকোত্তর পড়তে পারে। Course শুরুর ১ বছর পর পড়া ছেড়ে দিলে পড়ুয়ারা পাবে vocational course-এর সার্টিফিকেট। এই ভাবে ২ বছর পর মিলবে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট, ৩ বছর পর মিলবে গ্র্যাজুয়েশন সার্টিফিকেট, আর ৪ বছর পর মিলবে ডিগ্রি সার্টিফিকেট। কলেজগুলিতে নানা বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু হলেও প্রচুর শিক্ষক লাগবে বলে নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে যা বর্তমান সময়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কলেজ শিক্ষক হিসেবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি অনেকেই বাবা-মার কথামতো কোনো বিষয় নিয়ে পড়া শুরুর পর ক্রমশ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, অথচ কোনো উপায় না থাকায় সে বাধ্য হয়ে সেই বিষয়ে পড়া চালিয়ে যায় এবং কোনো রকমে পাশ করে বা না করে ক্রমশ সমাজের মূল স্রোত থেকে হারিয়ে যায়।

একইভাবে অনেক ছাত্র-ছাত্রী কোনো প্রশিক্ষণমুখী শিক্ষার সুযোগ পেলেও কলেজের কোর্স শেষের আগে তাতে যোগদানের অনুমতি পায় না। ফলে তার মন ঐদিকে থাকলেও তাতে যোগদান করতে না পেরে সে মনমরা হয়ে কলেজের পড়া চালিয়ে

যেতে বাধ্য থাকে। গরিব, মধ্যবিত্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণে যোগ দেওয়া হয়ে উঠত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। নতুন শিক্ষানীতি কলেজ পড়ুয়াদের এই দোলাচল থেকে মুক্তি দেবে। (৪) কলেজ ছাড়ার ৭ বছরের মধ্যে কেউ আবার সেই কলেজের পড়ায় ফিরে আসতে পারে। অন্য কলেজেও যেতে পারে তার এবিসি (অ্যাকাডেমিক ব্যাংক অব ক্রেডিট) নিয়ে। কোর্স-এ যোগ দেওয়া বা ছেড়ে দেওয়ার সময় এবিসি-র মাধ্যমে পড়ুয়াদের ক্রেডিট দেওয়া হবে এবং তার ভিত্তিতে তাদের যোগ্যতার বিচার হবে। (৫) পাশাপাশি ৫ বছরের ইন্টিগ্রেটেড স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হবে। চলতি শিক্ষা ব্যবস্থায় ছেলে-মেয়েরা স্নাতক স্তর উত্তীর্ণের পরে কিছু করার নেই বলে অর্থাৎ চাকরির সুযোগ বা প্রশিক্ষণ না মেলায় স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে ভর্তি হতে বাধ্য হয় এবং তারপর ওই একই কারণে গবেষণার কাজে ব্রতী হয়। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক ছাত্র-ছাত্রীদেরই উচ্চশিক্ষায় না থাকে আগ্রহ, না থাকে নিষ্ঠা। পরিবারের প্রয়োজনে অনেকেরই মন পড়ে থাকে চাকরির দিকে। অনেকে গবেষণার কারণে প্রাপ্ত বৃত্তির টাকা সংসারের সাহায্যে ব্যয় করে যার দরুন গবেষণার মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে অধিকাংশ গবেষণার মান হয় নিম্ন স্তরের যা দেশের বা সমাজের কোনো কাজে লাগে না। কিন্তু নতুন শিক্ষানীতিতে শুধুমাত্র যোগ্য এবং ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীরাই গবেষণার সুযোগ পাবে বলে গবেষণার মানও হবে ঊর্ধ্বমুখী। (৬) আইন বা ল এবং মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া বাকি সমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থার ছাতার তলায় আসতে চলেছে। (৭) একইভাবে সরকারি ও বেসরকারি, সমস্ত স্কুল ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিন্ন রেগুলেশন চালু হবে। (৮) শিক্ষার্থীরা দেশের যে কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে CUET (Combined University Entrance Test)-এর মতো এক অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে, যেটি বর্তমান বছরে প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয়েছে, অসম্পূর্ণ অবস্থায়। ক্রমশ এটি দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এর আওতায় নিয়ে আসবে। মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিঙের জন্য সর্বভারতীয় অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা দেশজুড়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এই ভর্তির পরীক্ষাগুলি হচ্ছে নতুন শিক্ষানীতির অনুসারী। (৯) স্কুল শিক্ষকতার বিষয়েও পরিবর্তন আসছে যা হবে নতুন শিক্ষানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে স্কুল শিক্ষকতার ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা হবে ৪ বছরের ইন্টিরগ্রেটেড বি.এড ডিগ্রি। এই কারণে শিক্ষকদের জন্য একটি নয়া এবং বিস্তারিত শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে যার নাম National Curriculum Framework for Teachers' Education (NCFTE) যেটি তৈরি করবে National Council for Teachers' Education (NCTE)। বর্তমানে NCERT-এর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এই নয়া পাঠক্রম তৈরি হবে।

এর সঙ্গে বলা হয়েছে (১) আঞ্চলিক ভাষায় অনলাইন কোর্সে জোর দেওয়া হবে যার বেশিটাই হবে বৃত্তিমূলক। (২) সবার কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেবার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। (৩) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দেশে ১০০ শতাংশ সাক্ষরতার লক্ষ্য পূরণ করা হবে। (৪) এবং সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হিসাবে যত দ্রুত সম্ভব শিক্ষাক্ষেত্রে জিডিপি-র ৬ শতাংশ খরচ করবে সরকার।

এই সময়ে সমন্বয়ে দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বহু প্রতীক্ষিত ও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসবে যা দেশে ক্রমপ্রসারমান অর্থনীতির বৃদ্ধির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এগিয়ে যাবে এবং অর্থনীতির বৃদ্ধিকে দ্রুততর করবে। ❑

গণতন্ত্র ভারতের ডিএনএ-তে আছে : আমেরিকায় মোদী

শিতাংশু গুহ

আমেরিকা আসলেই কি বাংলাদেশের কাছে 'সেন্ট মার্টিন' চেয়েছে এবং র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা, ভিসা বাতিল ইত্যাদি কি এ কারণেই? ঘটনাা তা নয়, নির্বাচনী বছর কতকিছুই তো শোনা যাবে। এসব বলা হচ্ছে 'নির্বাচনী কৌশল' হিসেবে। আমেরিকা জানে ভারত তাঁর নাকের ডগায় 'সেন্টমার্টিন' দ্বীপে কাউকে বসতে দেবে না। এ মুহূর্তে বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্ব সর্বোচ্চ পর্যায়ে, বাংলাদেশ তা করবে না। বাংলাদেশ যদি কখনো 'মিনি-পাকিস্তান' হয় এবং এর সরকার 'অ্যান্টি-ইন্ডিয়া' হয়, তখনো এটি কতটা সম্ভব তা ভবিষ্যৎ বলবে। এরই মধ্যে ২৬ জুন ২০২৩-এ মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রধান মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন যে, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ নেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র কখনই বাংলাদেশের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা করেনি। তিনি বলেন, যা বলা হচ্ছে তা সঠিক নয়। আমরা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করি।

এদিকে বারাক ওবামার টিভি সাক্ষাৎকার নিয়ে ট্রল হচ্ছে। টিভি সাংবাদিক ক্রিস্টিনা মারিয়া হাইদে আমানপুরের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ওবামা বলেছেন যে, মানবাধিকার ও সাম্প্রদায়িক ইস্যু বাড়তে থাকলে বা সংখ্যালঘু স্বার্থ না দেখলে ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। স্মর্তব্য যে, এই টিভি সাংবাদিক কিছুকাল আগে জননেত্রী শেখ হাসিনার একটি সাক্ষাৎকার নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলেন। মোদীর সফরকালে এই সাক্ষাৎকার 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' তা বোঝা খুব একটা কষ্টকর নয়। বাইডেন মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, একদা তাঁর 'বস' ওবামা উলটো গাইছেন। এটাই আমেরিকা। সত্য হচ্ছে, ভারত ভাঙার ষড়যন্ত্র চলছে, ওবামা এতে নতুন সংযুক্তি। একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী যথেষ্ট পুলকিত।

এক সময় অধিকাংশ বাংলাদেশি মুসলমান 'হুসাইন' দেখে ওবামাকে ভোট দিয়েছিল। এখন 'হুসাইন' আবার আলোচনায় এসেছে। হোয়াইট হাউস যৌথ সংবাদ সম্মেলনে 'দ্য

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এর সাংবাদিক সাবরিনা সিদ্দিকি মানবাধিকার ও মুসলিম অধিকার নিয়ে মোদীকে একটি প্রশ্ন করেন, এ মুহূর্তে তাকে নিয়েও ট্রল হচ্ছে। বলা হচ্ছে তিনি 'পাকিস্তানি মুসলমান', কথা কিন্তু সত্য। হোয়াইট হাউস অবশ্য সাংবাদিক হয়রানির নিন্দা করেছে। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাউন্সিলওমেন শাহানা হানিফও মোদীর সফরের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছেন। ৭৫ জন আইনপ্রণেতা মোদীর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, এই তালিকায় বার্নি স্যান্ডার্স থেকে জয়পাল পর্যন্ত আছেন। যারা মোদীর বিরোধিতা করেছেন, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাঁরা 'বাম-ঘেঁষা' অথবা 'ইসলাম-পছন্দ' অ্যান্টি-ইন্ডিয়ান।

নানান কারণে বাইডেন প্রশাসন ডেকে এনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছেন। এটি রাষ্ট্রীয় সফর। দুই-দুইবার মোদী কংগ্রেসের যৌথ-সভায় ভাষণ দিয়েছেন। আমেরিকায় এই প্রথম সর্বত্র 'মোদী মোদী' ধ্বনিতে উল্লাস দেখা গেছে। এতে বিরুদ্ধবাদীরা ভড়কে গেছে। কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশন শেষে 'ভারত মাতাকী জয়' শুনে ভারত বিরোধীদের ভালো লাগার কথা নয়। গার্ডিয়ানের মতে উইনস্টন চার্চিল, নেলসন ম্যান্ডেলার মতো সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে বারবারই মোদী মোদী ধ্বনি উঠেছে। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেখানে মোদী দীপ্তকণ্ঠে বলেছেন, 'উই আর হোমস্ টু অল ফেইথ'।

হোয়াইট হাউসে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে মানবাধিকার ও মুসলমান অধিকার নিয়ে সাংবাদিক সাবরিনা সিদ্দিকি'র প্রশ্নের উত্তরে মোদী বলেছেন, ভারত আমেরিকার মতোই গণতান্ত্রিক দেশ, সেখানে সবাই সমান অধিকার ভোগ করেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্র আমাদের 'ডিএনএ'-তে আছে, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা সহনশীল ও সমানাধিকারের ওপর ভিত্তিশীল। প্রেসিডেন্ট বাইডেন প্রায় একই কথা বলেছেন। পরক্ষণে যৌথ সভায় মোদী বলেছেন, আমেরিকাতে ৯/১১ হয়েছে, ভারতের মুম্বাইতে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে, সন্ত্রাসবাদ এখনো হুমকী, আমাদের যৌথভাবে এর মোকাবেলা করতে হবে। কেউ কেউ একথাটি 'শেখ হাসিনার' সরকারের পক্ষে বলে মন্তব্য করছেন। কারণ শেখ হাসিনার বিকল্প পাকিস্তানপন্থী সরকার, যা ভারত চায় না। একজন ভারতীয় সাংবাদিক নয়নীমা বসু কিছুকাল আগে বলেছিলেন যে, মোদী বাংলাদেশের ২০১৮ সালের নির্বাচন মেনে নিতে ট্রাম্প প্রশাসনকে রাজি করিয়েছিলেন। হ্যাঁ, সম্ভবত এবারো মোদী গরম বাইডেনকে নরম করবেন।

মোদী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আমেরিকা হচ্ছে ওল্ডেস্ট ডেমোক্রেসি, আর ভারত হচ্ছে লারজেস্ট ডেমোক্রেসি। মোদী ও বাইডেন দু'জনই বলেছেন বর্তমানে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক সর্বকালের ঘনিষ্ঠতম। এই উষ্ণ সম্পর্ক আনন্দঘন করতে হলে বাইডেন প্রশাসনকে হয়তো 'ঢাকা-কে কিছুটা ছাড় দিতে হবে। বাইডেন প্রশাসন মোদীকে যতই সমাদর করুক, দেখা যাচ্ছে আমেরিকায় একটি শক্তিশালী 'অ্যান্টি-ভারত' লবি সুসংগঠিত ভাবে কাজ করছে এবং এই গ্রুপ একই সঙ্গে 'অ্যান্টি-শেখ হাসিনা' বা 'অ্যান্টি-আওয়ামি লিগ'। পাকিস্তানপন্থী এই গ্রুপ আমেরিকায় গণতন্ত্রের সুযোগে নিয়ে কখনো মোদী বিরোধিতা, কখনো শেখ হাসিনা বিরোধিতা করে দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র বিরোধী শক্তিকে মদত দিচ্ছে। এঁরা ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ককে নড়বড়ে করতে চায়। ◻

শেষবেলায় ধর্মচর্চা!

অর্থের মোহ, যশের মোহ, নামের মোহ— এসবের কথা আমরা শুনেছি। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার কথাও শুনেছি, কিন্তু কী কারণে বা কী আশ্চর্য ভাবে বোধহয় পুঁথিগত বিদ্যার কারণে আমার মনে হয় আমার কাছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'টাই শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির ঘরে বুক শেল্ফে নানারকম বইয়ের সম্ভার দেখা যায়। যেমন— রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ। এছাড়া নানারকম রচনাবলীতে গৃহ সুসজ্জিত থাকে। কখন এই বইগুলি তাঁরা পড়েন বা পড়েছেন এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ হয়। তৃণমূলের এক সময়ের মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এখন হঠাৎ করে জেলে বসে বই পড়ার চেষ্টা করছেন। শুনেছি নানারকম বইয়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত আছে। অর্থাৎ এতদিন এত পাণ্ডিত্য অর্জন করে, কাম ও কামিনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, শেষবেলা একটু ধর্মচর্চা করছেন। এটাই বুঝি বুদ্ধিমানের কাজ!

ব্যাপারটা অনেকটা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যেটা কিন্তু মোটেও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি নয়, এঁদের কাজকর্মের সঙ্গে তুলনীয়। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরে গেলেও সেই একই ট্র্যাডিশন চলছে। অর্থাৎ পরিবর্তন কিছু হয়নি উলটে চলেছে দমন উৎপীড়ন। সেটা ক্রমশই আরও ভীষণাকার ধারণ করছে— ইতিহাসের লিখন পড়বার ক্ষমতাটাই হারিয়ে ফেলেছে, ওই অতি দর্প, অতি মানসুনামের অন্তরালে। 'History repeats itself'— একেবারে কঠিন বাস্তব, সত্য কথা। এ ব্যাপারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি কথা স্মরণ করব— ঠাকুর, 'মা মা করিয়া কাঁদিতেন, সর্বদা মার সঙ্গে কথা কহিতেন, মার কাছে উপদেশ লইতেন। বলিতেন, 'মা তোর কথা কেবল শুনব; আমি শাস্ত্রও জানি না, পাণ্ডিত্যও জানি না। তুই বুঝাবি তবে বিশ্বাস করব' ঠাকুর জানিতেন ও বলিতেন, 'যিনি পরব্রহ্ম, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই মা'।

এখন মরণকালে কেষ্টবাবু তারামা, কৌশিকী মা ইত্যাদির নাম করছেন, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস যে নীতিজ্ঞানহীন নেতৃত্বের প্রতি! জয়প্রকাশ নারায়ণের সময়ে ইনি অভব্য আচরণ করেছিলেন তা যাঁরা জানে তাঁরাই এই সব কথা বলতে পারেন —সে কথা কি কারও অজানা? তিনি ও তাঁর সুকন্যার কী হলো— তাতে কী যায় আসে? শুধু তিনি ও তাঁর ছেলে (শ্রীভাইপো) বাঁচলেই হলো— কী সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ করাবে কে?

শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উক্তি স্মরণ করে সমাপ্ত করি। 'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। একেকে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি; অগ্নি মানলেই দাহিকা শক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।' পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসক সম্পর্কে বলা যায়— একই ব্যক্তি নাম রূপভেদে তিনি!

—দীপক খাঁ,
পাটপুর, বাঁকুড়া।

ভার্চুয়াল সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণে 'সন্ত্রাসবাদ'

রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে 'সন্ত্রাসবাদ' কোনো নতুন তত্ত্ব বা পদ্ধতি নয়। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে ১৭৯৩ সালে কথাটি রাজনৈতিক অর্থে প্রথম ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পদ্ধতি হিসেবে সন্ত্রাসবাদকে ব্যবহার করা হয়েছে। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে কারণ হিসেবে আমরা মানব সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় সন্ত্রাস আবার নিরীহদের উপর সন্ত্রাস, অকারণ নিষ্ঠুরতা, বীভৎসতা এবং জনসাধারণের ত্রাসের ব্যাপকতা খুব স্পষ্ট করে অনুভব করেছি।

বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সন্ত্রাসবাদের বিচার বিশ্লেষণে সমাজ বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, প্রশাসক, বিচারক, নিরাপত্তা কর্মী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই সন্ত্রাসীদের উৎস খুঁজে পেয়েছেন। সন্ত্রাস সৃষ্টিতে হিংসা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ অপরিহার্য। কিন্তু সমস্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপই সন্ত্রাস নয়। আলোচ্য বিষয় আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত-পাক বাক্‌যুদ্ধ নতুন নয়। সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে ভার্চুয়াল সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে নাম না করে পাকিস্তানকে নিশানা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর আগে জি-২০ এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভা মঞ্চেও সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে পাকিস্তানের সমালোচনা করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তবে চীন ও রাশিয়ার দুই রাষ্ট্রপ্রধান শি জিনপিং ও ভ্লাদিমির পুতিনের উপস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে এরকম বার্তা দেওয়ার তাৎপর্য বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এসসিও'র সদস্য দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতাও স্মরণ করে দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় গত দু'দশক ধরে এসসিও গোটা ইউরেশিয়া (ইউরোপ ও এশিয়া) অঞ্চলে শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, আমি খুশি যে ইরান আজ এসসিও পরিবারে নবম সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৮ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পাকিস্তানে আইএসআই অপারেশন টুপাক বা কাশ্মীরি উগ্রপন্থীদের সাহায্য দেওয়া শুরু করে। অপারেশন টুপাকের লক্ষ্য ছিল ভারতকে খণ্ডবিখণ্ড করা।

আমরা যদি অনুপুঙ্খ দৃষ্টিতে দেখি দেখবো ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে গান্ধীজীর সুদীর্ঘ অহিংস আন্দোলনের বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় বহন করেছে। ধর্মীয় হিংসায় নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দেশ ভাগ। অন্যদিকে সহিংস স্বাধীনতার পরিচয় বহন করেছে। ধর্মীয় হিংসায় নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও দেশ ভাগ। অন্যদিকে সহিংস স্বাধীনতার নেতৃত্ব দানে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর ছিল— 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' নেতাজীর দর্শন ছিল ধর্মীয় সম্প্রীতিতে নির্মল। দুঃখের বিষয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জয় নেতাজী ও বীর বিপ্লবীদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করেননি।

বর্তমান সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং এক দেশ, এক প্রধান, এক নিশান অর্জিত হয়েছে। তাঁর এই সাংহাই শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শান্তির দিশা দেখাবে এটাই প্রত্যাশা।

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,**
প্রথম খণ্ড শিয়ালদহ, রাশিডাঙ্গা-২।

মানব হিতৈষী শ্যামাপ্রসাদ

স্বস্তিকা পত্রিকায় গত ৩ জুলাই প্রচ্ছদ নিবন্ধ 'শিক্ষাবিদ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি' পড়ে খুব ভালো লাগল। বিভিন্ন লেখক তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন তাঁদের বক্তব্য। শ্যামাপ্রসাদের জীবনের প্রকৃত মূল্যায়ন আজ পর্যন্ত যথাযথ ভাবে হয়নি। আগামী প্রজন্মের কাছে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নাম মুছে দেবার চেষ্টাই বরং করা হয়েছে। এই মহান পুরুষকে কিছু রাজনৈতিক নেতা তাঁদের নিজস্বার্থ রক্ষার তাগিদে বরাবর ব্যবহার করে গেছেন। তার প্রকৃত উদাহরণ তাঁর মৃত্যুর খবর আজ পর্যন্ত ঠিকঠাক প্রকাশ হয়নি। আজও ভারতবর্ষের মানুষ সঠিক জানেন না ড. মুখার্জির মৃত্যুর কারণ কী? রাজনৈতিক অভিসন্ধির ফলে কিছু রাজনৈতিক নেতা এই সত্য উদ্ঘাটন করতে চায় না।

রাষ্ট্রনেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ছিলেন একজন শিক্ষাব্রতী। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। পরবর্তী জীবনে তিনি রাজনৈতিক নেতা হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর আদর্শ, তাঁর শিক্ষা আজও সাধারণ মানুষ কতটুকু জানেন? তিনি যে কত বড়ো মানবদরদি ও মানব হিতৈষী মানুষ ছিলেন তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন হয় নাই? তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কতজন মানুষের কাছে পৌঁছেছে, তা আজও অজানা। তিনি বরাবর মানুষের সমস্যার কথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁহার মধ্যে কোনো প্রকার গোঁড়ামি কখনও কেউ দেখেনি। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখ্যার্জি বিভিন্ন রাজনৈতিক হিংসার শিকার হয়েছেন বরাবর। একদিন হয়তো এই মহান তেজস্বী পুরুষের মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটন হবে। বাঙ্গালি হিন্দু শ্যামাপ্রসাদকে একদিন চিনিবে। তাঁর প্রকৃত জীবন, তাঁর শিক্ষানীতি, তাঁর মহান উদ্দেশ্যের কথা সমগ্র বিশ্ব একদিন জানতে পারবে। হয়তো সেইদিন বেশি দেরি নেই।

—**সঞ্জয় ব্যানার্জি,**
চুঁচুড়া, ব্যারাক রোড, হুগলী।

ভুল

(১) 'মিসিং লিংক'—স্বস্তিকা, ১৬ মে, ২০২২; পৃ. ১৮-তে বলা হয়েছে— বালী যখন এক মায়াবীর সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, তখন সুগ্রীব বালীকে এক গুহায় বন্দি করেছিলেন। কথাটি ঠিক নয়। প্রকৃত ঘটনা হলো— মায়াবী নামের এক তেজস্বী অসুর এক রাতে কিষ্কিন্ধ্যায় এসে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করছিল। বালী ও সুগ্রীব, দুজনে বেরিয়ে এলে মায়াবী পালিয়ে এক বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছন্ন দুর্গম ভূবিবরে প্রবেশ করে। সেই দেখে, বালী সুগ্রীবকে গুহাদ্বারে পাহারায় রেখে ভিতরে ঢুকেছিলেন। পরে এক সময় সেই গুহামুখ দিয়ে সুগ্রীব তাজা রক্ত বের হতে দেখেন, সেই সঙ্গে শুনতে পান অসুরদের বীরনাদ; কিন্তু বালীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাননি। ওই সব দেখে শুনে অসুরদের হাতে বালীর বিনাশ হয়েছে ভেবে বিশাল এক প্রস্তরখণ্ড দ্বারা গুহাদ্বার বন্ধ করে রেখে দিয়ে এবং বালীর তর্পণ করে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে গিয়েছিলেন— ('রামায়ণ', কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—সর্গ-১-১১)।

(২) স্বস্তিকা, ১৩ মার্চ, ২০২৩; পৃ. ৩৬-এ উত্তম মণ্ডল মহাশয়ের 'শ্যামাপ্রসাদের হস্তক্ষেপে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম' বিশেষ রচনায় ড. আম্বেদকরের কথা '...To consento to redraw the boundaries, to have the Muslims and Hindus placed under seperate National States and thus rescue the 44 P.C. of Hindus from the horrors of Muslim Rule?' উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে— এরপর বাঙ্গলার মুসলমান নেতারা এবং হিন্দুদের তরফে শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ...কিরণ শঙ্কর রায় বিষয়টি নিয়ে গান্ধীর মাধ্যমে দিল্লিতে সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন...।' উদ্ধৃতিটি থেকে ড. আম্বেদকরের মূল বক্তব্য সঠিক ভাবে ধরা যায় না। তিন হিন্দুনেতা সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে কোন বিষয়ে কথা বলতে দিল্লি গিয়েছিলেন, তাও পরিষ্কার করে বলা হয়নি। ধরে নেওয়া যেতে পারে, মে মাস (১৯৪৭) ধরে যখন সমগ্র ভারতবর্ষ আসন্ন বিভাগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গপ্রদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে গঠন করে রাখার ভাবনা চলছিল। ওই ভাবনার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু এবং মুখ্য পরামর্শদাতা কিরণ শঙ্কর রায়। বিতর্কিত ওই ভাবনাটির প্রধান সংগঠকের ভূমিকায় ছিলেন হুসেন শাহিদ সুরাবর্দি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কখনোও অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গ গঠনের উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,** কলকাতা-৬০।

চিরন্তনী মা

বিদিশা ভট্টাচার্য

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'

কাঠফাটা রোদ্দুর, কোথাও একটু ছায়া নেই। কোলের ছেলেটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে রাস্তার একধারে। রোদ আড়াল করতে তার মাথায় একটা ছেঁড়া ছাতা ধরে আছে। যখনই ছেলেটি ভয়ে কেঁদে ওঠে তখনই ভালোবাসার বাহুডোরে আগলে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নেয়। তিনি আর কেউ নন। খুব মধুর সেই শব্দ 'মা'। যার হয় না কোনও সংজ্ঞা, হয় না কোনও বিশ্লেষণ। শুধুই শব্দটির উচ্চারণের মধ্যে রয়েছে মধুর শান্তি।

প্রত্যেক বছরে মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে মাদারস ডে পালনের পালা আসে। পৃথিবীর সব দেশে অবশ্যই একই দিনে মাদারস ডে পালিত হয় না। তবে আমেরিকাতে হয় বলে তার দেখাদেখি বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই ওই দিনটিতে 'মাদারস ডে' সেলিব্রেট করা হয়। মায়ের থেকে এ বিশ্বে বড়ো আর কেউ নয়। আমরা সবাই বড়ো হই মায়ের বুকভরা স্নেহ, পরম আদর আর গভীর ভালবাসায়। প্রত্যেক মানুষের বড় হওয়ার পিছনে থাকে মায়ের সঠিক পথনির্দেশ। ছোট্টো সেই বাচ্চা যখন সত্যিই বড়ো হয়, তখন মা-ই সবথেকে বেশি খুশি হন। শিশুটি যখন বড় হয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মায়ের চোখে মুখে ফুটে ওঠে সাতরঙা রামধনু। পরিতৃপ্তি, প্রশান্তি।

এমন আলোচনা করা যাক কিছু রত্নগর্ভা মায়েদের নিয়ে। বিদ্যাসাগরের দয়াবতী জননী ভগবতী সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দয়াবৃত্তি আরও অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায় কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনও প্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না।' আর রবীন্দ্রনাথের মা সারদা দেবী রত্নগর্ভা। সুভাষচন্দ্রের মা প্রভাবতী দেবী শুধু নেতাজীর মা ছিলেন না, সারা ভারতবাসীর মা। জীবনানন্দের মা কুসুমকুমারী দেবীই তো ছেলের মধ্যে সাহিত্যের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সাহিত্যবোধ গড়ে তুলেছিলেন। ছাত্রী হিসাবেও ছিলেন খুবই মেধাবী। নব্যযুগের প্রাণপুরুষ বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরী দেবীর কাছেই তো শুনেছিলেন মনীষী জীবনের রকমারি কাহিনী, রামায়ণ, মহাভারতের গল্প আর পারিবারিক ঐতিহ্যের কথা। অবনীন্দ্রনাথের মা সৌদামিনী ছিলেন প্রকৃতই মহীয়সী। মায়ের ভূমিকা ছেলের জীবনে ছিল গভীর ও ব্যাপক। বিভূতিভূষণের মা মৃণালিনী দেবী তো করুণার প্রতিমূর্তি। মায়ের সান্নিধ্যে বিভূতিভূষণের সোনারপুর

হরিনাভির দিনগুলি বেশ আনন্দই কেটেছে। ঠাকুর পরিবারের পর আছে ঐতিহ্যমণ্ডিত রায়চৌধুরি পরিবার। উপেন্দ্রকিশোর সুকুমারের রক্ত যাঁর শিরায় প্রভাব যাঁর জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, সেই সত্যজিৎ রায়ের মা সুপ্রভা রায়ের প্রেরণা ও ভূমিকা ছেলের জীবনে ছিল তুলনারহিত। সুপ্রভা দেবীর গান রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। ছাত্রী হিসাবেও তিনি ছিলেন খুব মেধাবী ও কৃতী।

মাদারস ডে' বহুকাল ধরেই আছে আর এই দিনে মা-কে মনে করবার সঙ্গে জড়িত আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোও চিরকালই ছিল। তবে আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত জনজীবন ও কমার্শিয়ালাইজেশনটা হয়তো বা বছর ১৫-২০ পুরোনো। আমেরিকায় অবশ্য একশো বছর আগেই মাদারস ডে' নিয়ে বাণিজ্য করার বিকৃত রূপ দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এই দিনের প্রতিষ্ঠাত্রী আনা জার্ভিস। সিংহভাগ মধ্যবিত্ত গৃহবধূ মায়েরা স্বামী, সন্তান, শাশুড়ির মাঝে পারিবারিক শান্তিটুকু বাদে নিজের ব্যক্তিগত অধিকারের খোঁজই নেননি কখনও। ব্যস্ত জীবনের দৈনিক কর্তব্য ও দায়িত্বগুলো ঠিক ঠিক পালন করতে করতে জানতেও পারেননি কখন 'মাদারস ডে' এসে গিয়েছে। মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে সেই মাদারস ডের দিকে অনেকটাই ছিল অচেনা, আদায়কারী বিদেশি হুজুগ। কয়েক বছরের পরিচয়ে সেটাই কিন্তু মধ্যবিত্ত মায়েদের শেখালো যে আত্মত্যাগের কথা না ভেবে মাতৃত্বকে গর্বের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে এবং অবশ্যই আত্মসচেতনার সঙ্গে উদ্‌যাপন করতে। এখন আর মধ্যবিত্ত মা মানে বদ্ধ রান্নাঘরের মধ্যে গরম ধোঁয়া নয়। পরিবারের সবার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে, সবার জন্য চিন্তা করে নিজের খাবার শেষে রাখা নয়, অর্থাৎ নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকে জলাঞ্জলি না দিয়ে মাতৃত্বের গুরুদায়িত্বকে সারা বছর আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়ে তা পালন করে মাদারস ডে'তে নিজেকে সেলিব্রেট করার দিন। মাতৃত্ব নিয়ে গর্ব করার দিন।

'মায়ের কোনও জাত নেই'— কথাটা কাজে ও ব্যবহারে সব সমাজে সেদিন করে দেখানো হবে যেদিন 'মাদারস ডে' তার আপাত কমার্শিয়ালাইজড ইমেজ মুক্ত হয়ে সার্থক রূপ পাবে। মাতৃরূপের পূজা বা অনাদর অবহেলা কোনওটাই চাই না আমরা।

'আমার জন্য সইলে তুমি কতই ব্যথা / বুঝিয়ে দিলে মা হওয়া নয় মুখের কথা।'

সত্যিই সন্তান হওয়া কোনও বড়ো ব্যাপার নয় কিন্তু মা হওয়া সত্যিই গর্বের ও আনন্দের। আর সেই মায়ের কোলে ঘুমপাড়ানি গান, ভালোবাসার হাতে কোমল স্পর্শে, হাত ধরে হাঁটতে শেখা, প্রথম বুলিতে মা বলা সবই তার জন্য। 'মা' রা জীবন পথে সুখ-দুঃখের একমাত্র সাথী। তবুও কেন বৃদ্ধাশ্রম? সেই উত্তরের সম্মুখীন হতে সব সন্তানই আজ বিহ্বল। তারা পারে কী করে? যার হাত ধরে বড়ো হওয়া তাঁকেই আবার হাত ছেড়ে দূরে সরিয়ে দিতে, এও সম্ভব? হয়তো দামি অর্থমূল্যের উপহার তাঁরা চান না। শুধু চান সন্তানের থেকে একটু ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। আমার এই অক্ষরমালা হয়তো কিছুই নয়, পৃথিবীর সমস্ত মায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য মাত্র। □

উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কে বেশ কিছু ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

এখন সকলের জীবনেই স্ট্রেস। গুঁড়ো থেকে বুড়ো কেউই বাদ যান না স্ট্রেসের কবল থেকে। আর তার ফলে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিসের মতো লাইফস্টাইল রোগগুলি ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে অনেকেরই শরীরে। আমাদের চারপাশের প্রতি চারজনের মধ্যে হয়তো-বা তিনজনই উচ্চ রক্তচাপের রোগী।

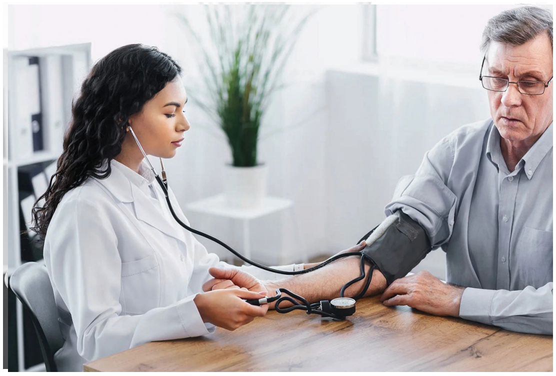

যেহেতু উচ্চ রক্তচাপ একটি লাইফস্টাইল ডিজিজ, সুতরাং ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি প্রেশার সারাতে জীবনযাত্রাতেও কিছু বদল আনতে হবে। কিন্তু কী খাব আর কী খাব না, উচ্চ রক্তচাপে কোনো কোনো উপসর্গ হলে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন— ইত্যাদি নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা মিথ রয়েছে। এইসব ভুল ধারণার চিকিৎসা বিজ্ঞানে কোনো ভিত্তি নেই।

সুতরাং এগুলো পালটানো দরকার। আসুন এই বিষয়ে জেনে নেওয়া যাক—

হাইপারটেনশন হলে ঘাড়ব্যথা হবেই--- ঘাড়ে ব্যথার নানান কারণের মধ্যে অনেকেই উচ্চচাপকে এগিয়ে রাখেন। সুতরাং, ঘাড়ব্যথা হলেই অনেকেই ভাবেন রক্তচাপ বেড়েছে। এই ধারণা অমূলক। কেননা চিকিৎসাশাস্ত্র জানাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই রক্তচাপ বৃদ্ধির কোনও উপসর্গ থাকে না। তবে হাড়ের সংযোগস্থলে কোনও সমস্যা হলে ঘাড়ব্যথা হয়, সেক্ষেত্রে দেখতে হবে স্পনডিলাইটিস জাতীয় কোনও রোগ রয়েছে কিনা।

রক্তচাপ বেশি হলে দুধ বা ডিম খাওয়া চলবে না--- দুধ, ডিম, মাংস ইত্যাদি উচ্চ প্রোটিনজাতীয় খাবার খেলে রক্তচাপ বাড়ার ধারণাটি ভ্রান্ত। রক্তচাপ বাড়তে দেখলে অনেকেই দুধ বা ডিম খাওয়া ছেড়ে দেন। কিন্তু আসলে বেশি নুন দেওয়া বা নুন জাতীয় খাবারের সঙ্গেই হাইপারটেনশনের রিস্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের হৃদরোগের ঝুঁকি থাকে বলে তাঁদের অতিরিক্ত ফ্যাটজাতীয় খাবার, যেমন— ডিমের কুসুম, দুধের সর, রেডমিট খেতে বারণ করা হয়।

টক খান, রক্তচাপ কমবে--- এই ধারণাটিও সর্বৈব ভুল। হাইপারটেনশনে আক্রান্ত হওয়ামাত্র কেউ কেউ টক জাতীয় খাবার খান। এতে তো রক্তচাপ কমার কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ নেই-ই, উপরন্তু এই টকজাতীয় খাবার তৈরিতে ব্যবহৃত অতিরিক্ত নুনের জন্য রক্তচাপ বাড়ে। আবার নুন ছাড়া টকজাতীয় খাবার বা পানীয় খেলে অ্যাসিডিটি হতে পারে। সুতরাং রক্তচাপ বাড়লে টক খাবার নিয়ে কোনও এক্সপেরিমেন্ট না করাই শ্রেয়।

নুন ভেজে খাওয়া যেতে পারে--- উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় চিকিৎসকরা কাঁচা নুন তো খেতে বারণ করেনই। উপরন্তু অতিরিক্ত নুন দিয়ে রান্না করা খাবারের ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অনেকেই সেক্ষেত্রে রান্নায় ভাজা নুন দেন। ভাবেন হালকা ভেজে নুন রান্নায় দিলে তা ক্ষতি করবে না। কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উলটো। নুন যেভাবেই খান না কেন, রক্তচাপ বাড়ানোর জন্য দায়ী।

হাইপারটেনশনে ওষুধ চলবে না— যাঁদের একবার হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, রক্তচাপ ওষুধ খেয়ে স্বাভাবিক থাকলে তা বন্ধ করে দেন। ওই তো প্রেশার কম আছে, খামোখা ওষুধ খেতে যাব কেন, ভাবেন অনেকে। কিন্তু এটা অনুচিত। উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে তার নানান পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়।

ওষুধ বাদ দেওয়া--- রক্তচাপ বেড়েছে কিন্তু ঘাড়ে বা মাথায় কোনও কষ্ট নেই, এই অজুহাতে অনেকেই ওষুধ বন্ধ করতে চান, কিংবা মাঝেমধ্যে গ্যাপ দিয়ে ওষুধ খান। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কোনও উপসর্গ না থাকলেও উচ্চ রক্তচাপ থেকে ধীরে ধীরে হৃদরোগের সমস্যা, দৃষ্টিহীনতা, কিডনির কার্যকারিতা নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

তাই এইসকল দীর্ঘমেয়াদি জটিলতা এড়াতে ওষুধ খেতেই হবে। অনেকে ভাবেন প্রেশারের ওষুধ একবার শুরু হলে সারাজীবন খেয়ে যেতে হয়, তাই বলে অনেকে ওষুধ শুরু করতে চান না। এটা একেবারেই ভুল ধারণা। রোগ হলে ওষুধ খেতে হবে। নাহলে জটিলতা বাড়বে বই কমবে না।

টেনশনই একমাত্র কারণ

রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্য যে সকল কারণ দায়ী তার জন্য টেনশন অন্যতম কারণ হলেও একমাত্র বা প্রধান কারণ নয়। তবে হ্যাঁ, মানসিক উৎকণ্ঠা থেকে উচ্চ রক্তচাপ হয়। অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, ওবেসিটি, অতিরিক্ত তেল-মশলাযুক্ত খাবার খাওয়া, ধূমপান, অ্যালকোহল, জাংক ফুড, অতিরিক্ত নুন খাওয়া উচ্চ রক্তচাপের জন্য দায়ী। টেনশন কমিয়ে, এক্সারসাইজ, জীবনযাত্রার রদবদল ঘটিয়ে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি অনেকটাই কমানো যায়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের জয় ম্লান হয়েছে সন্ত্রাস ও হিংসায়

আনন্দ মোহন দাস

গত ৮ জুলাই ব্যক্তিগত কাজে দিল্লি গিয়েছিলাম। সেখানে তামিলনাড়ুর এক অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচয় হলো। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি শুনে প্রথমেই রাজ্যের হিংসা নিয়ে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম। তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী ও বিবেকানন্দের দেশে নির্বাচনে এত হিংসা, সন্ত্রাস ও মানুষ খুন কেন? সদুত্তর দিতে না পেরে লজ্জায় মাথা হেঁট এবং নিজেকে অপরাধী বলে মনে হলো। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, সারা ভারতে নির্বাচনী হিংসা যখন বন্ধ হয়ে গেছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ তার ব্যতিক্রম কেন? পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে আমাদের গর্ব করে বলার মতো আর কিছু নেই। বরং বঙ্গ সংস্কৃতির বড়াইকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে হিংসাই এখন পশ্চিমবঙ্গের চর্চার বিষয়। সেবার পরিবর্তে রাজনীতি যখন পেশা হয়ে দাঁড়ায়, তখন টাকার থলি বা মধুভাণ্ড হাতে পেতে দখলদারির লড়াই চলে। অতীতের অভিজ্ঞতায় এরাজ্যের নির্বাচনে মানুষ এখন ফলাফলের চেয়ে হিংসায় কত লোক মারা যাবে তার আশঙ্কায় আশঙ্কিত থাকে অনেক বেশি।

বর্তমান রাজত্বে নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে ভোটের দিন পর্যন্ত এবং নির্বাচনোত্তর পর্বে হিংসায় ৫০ জনের বেশি মানুষের প্রাণ গিয়েছে। যাদের রাজনীতির সঙ্গে কোনো যোগ নেই এরকম কয়েকজন নিরীহ সাধারণ মানুষেরও বোমা গুলিতে প্রাণ চলে গেছে। শাসকদলের সন্ত্রাস ও অত্যাচারে বিরোধী দলের মানুষরা ভীত ও সন্ত্রস্ত। শাসক দলের অত্যাচারের আশঙ্কায় অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। এমনকী পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসমে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। বলতে লজ্জা হয় এই হলো বিদ্যাসাগর, রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গভূমি। রবীন্দ্রনাথ গানের মধ্যে দিয়ে এই বাঙ্গলাকে সোনার বাঙ্গলা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বীরপ্রসবিনী বঙ্গদেশকে জাতীয় সংগীত উপহার দিয়েছেন। এই বঙ্গেই বন্দেমাতরমের জয়ধ্বনি উদ্‌ঘোষিত হয়েছে। এই বাঙ্গলাই একসময় স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পশ্চিমবঙ্গ আজ রক্তাক্ত ও কলুষিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয়, কোথায় গেলেন আমাদের সেই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা। যারা দেশে গণতন্ত্র-ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও অসহিষ্ণুতার ধুয়ো তুলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অহরহ প্রতিবাদ করে থাকেন। এরা আখলাক, হাথরস কাণ্ড নিয়ে দেশব্যাপী শোরগোল তুলে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণ করেন। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এরাজ্যের হিংসা ও মৃত্যু নিয়ে আজ তাঁরা নীরব রয়েছেন। এ রাজ্যের নির্বাচনী হিংসায় ৫০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হলেও তাঁরা প্রতিবাদে সোচ্চার হন না। শাসকের অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদে কোথায় সেই মোমবাতির মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ? কেন আজ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর গর্জে ওঠে না? খুব আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হয় অমর্ত্য সেন, কবি জয় গোস্বামী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও কৌশিক সেনের মতো ব্যক্তি যাঁরা নিজেদেরকে বঙ্গসংস্কৃতির ধারক বাহক মনে করে থাকেন, তাঁরা আজ চুপ কেন? কোনো এক অজানা কারণে এরা পছন্দমাফিক প্রতিবাদে বিশ্বাস করেন।

পশ্চিমবঙ্গে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনী হিংসা ও সন্ত্রাসের জন্য নির্বাচন কমিশনার ও রাজ্য সরকারের অযোগ্যতাই দায়ী বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশকে দলদাসে পরিণত করে তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দেওয়ার পরিণতি হলো এই মৃত্যুমিছিল ও সন্ত্রাস।

পেশীশক্তির বলে শাসকের ভোটদান পর্বে হিংসা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে ছাপ্পাভোট, পুকুরে ব্যালট বাক্স ফেলে দেওয়া, গণনায় কারচুপি করতে বিরোধীদের বসতে না দেওয়া এবং খুশিমতো নিজ প্রার্থীকে জিতিয়ে দেওয়া— এই হলো এরাজ্যের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শান্তিপূর্ণ ভোটযুদ্ধ। একে নির্বাচনী পরিহাস বা প্রহসন বললেও অত্যুক্তি হয় না। সবগুলি হলো স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে একদলীয় শাসন কায়েম করার নিষ্ঠুর প্রয়াস মাত্র। এরাই আবার 'গণতন্ত্র বিপন্ন' বলে নরেন্দ্র মোদীর আদ্যশ্রাদ্ধ করে থাকেন।

এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে একটি বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় বিরোধী দলের প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেওয়া ব্যালট পেপার খেয়ে শাসকদলের পরাজিত প্রার্থীকে বিজয়ী প্রতিপন্ন করা।

দেখা গেছে অনেক বিডিও বিরোধী প্রার্থীদের সার্টিফিকেট না দিয়ে বসিয়ে রেখে বিজয়ী বিরোধী প্রার্থীকে তৃণমূলে যোগদানের পথ সুগম করেছেন। জাঙ্গিপাড়া-সহ অনেক স্থানে প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর করা ব্যালট পেপার রাস্তায় ও নর্দমায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। সেজন্য আদালতে বিডিওকে তলব করা হয়েছে। বিরোধী প্রাথীদের পক্ষে ভোট দেওয়া ব্যালট পেপারও যত্রতত্র রাস্তায় পড়ে থাকার অভিযোগও উঠেছে। আরও অভিযোগ উঠেছে ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঠিকমতো প্রয়োগ না করে, বসিয়ে রেখে দলীয় প্রার্থীদের জেতাতে নির্বিচারে ভোট লুঠ করতে সাহায্য করা হয়েছে। কারণ রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনার প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরোধিতা করে আদালতে গিয়েছে।

সুতরাং সুপরিকল্পিতভাবে নির্বাচন কমিশন বাহিনী নিয়োগ সংক্রান্ত ষড়যন্ত্রে শামিল হয়ে হিংসায় মদত করেছেন বলে বিরোধীরা অভিযোগ করেছেন। ভারতবর্ষের কোনো পঞ্চায়েত নির্বাচনে এত বেশি আদালত হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছে বলে জানা নেই। কারণ আইনের শাসনের পরিবর্তে শাসকের আইন চললে জনগণের একমাত্র ভরসা হলো আদালত। তাই গণতন্ত্র রক্ষায় আদালতের হস্তক্ষেপ স্বাভাবিক। নির্বাচনের পরিসংখ্যানগত দিক থেকে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট পোলিং বুথ ছিল ৬১৬৩৬টি। গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন ছিল ৬৩২২৯, পঞ্চায়েত সমিতির আসন সংখ্যা ৯৭৩০ এবং জেলা পরিষদ আসন ছিল ৯২৮টি। পাঁচ কোটি ৬৭ লক্ষ ভোটার ছিলেন। তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৮ সালে ভোট দানের শতকরা হার ছিল ৮২.১৩ কিন্তু এবারের ভোট দানের শতকরা হার ছিল ৮০.৭১ শতাংশ অর্থাৎ ১.৪৬ শতাংশ ভোটদানের হার কমেছে। ২০১৮ ও ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দল অনুযায়ী ভোট প্রাপ্তির শতকরা হার নিম্নরূপ :

	২০১৮	**২০২৩**
তৃণমূল	৫৬%	৫১%
বিজেপি	১৯%	২৩%
সিপিএম	১২%	১৩%
কংগ্রেস	—	৬%

২০১৮ সালে তৃণমূল ৩৪ শতাংশ আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছিল। ২০২৩ সালে তা হ্রাস পেয়ে ১২ শতাংশে দাড়িয়েছে।

ওই পরিসংখ্যানে দেখা যায়, হিংসা ও সন্ত্রাস সত্ত্বেও ২০২৩ সালে তৃণমূলের ৫ শতাংশ ভোট কমেছে। বিজেপির ৪ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি

পেয়েছে। সিপিএম ও কংগ্রেস জোট করা সত্ত্বেও সিপিএমের মাত্র ১ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলনামূলক ভাবে ২০২৩ সালে বিরোধীরা বেশি সংখ্যক আসনে প্রার্থী দাখিল করার সুযোগ পেয়েছে। এর পিছনে কারণ হলো হাইকোর্টের কড়া নির্দেশ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিরোধীদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস। যদিও পরবর্তীকালে অনেক ক্ষেত্রে চাপ দিয়ে শাসকের পক্ষে বিরোধীদের নমিনেশন প্রত্যাহার করানো হয়েছে।

২০১৮ সালে ফলাফল অনুযায়ী প্রতিটি দলের আসন সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :

	তৃণমূল	বিজেপি	সিপিএম	কংগ্রেস
গ্রাম পঞ্চায়েত	৩৮১১৮	৬৭৭৯	১৪৮৩	১০৬৬
পঞ্চায়েত সমিতি	৮০৬২	৭৬৯	১১০	১৩৩
জেলা পরিষদ	৭৯৩	২২	১	৬

এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল নিম্নরূপ :

গ্রাম পঞ্চায়েত	৩৫,৬০৬	৯৮৮৯	২৯৯৯	২৬১৪
পঞ্চায়েত সমিতি	৬,৭১৬	১০৪৪	১৯২	২৭২
জেলা পরিষদ	৮৩৫	২৬	২	১২

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রায় ১৪০০০

আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। উপরোক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এবং সিপিএম অনেক পিছনে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম, কংগ্রেস জোট বেঁধে লড়াই করেছে। কারণ এরা এককভাবে লড়াই করার জায়গায় নেই। বর্তমান ফলাফলে শতাংশ হিসেবে গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১১.৭৫ শতাংশ কিন্তু বিজেপির আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৩ শতাংশ। ভয়াবহ সন্ত্রাস সত্ত্বেও বিজেপির ফলাফল— প্রাপ্ত আসন ও ভোটের শতাংশ হিসেবে শাসক তৃণমূলের চেয়ে অনেক বেশি। একথা অনস্বীকার্য হিংসা ও সন্ত্রাস উপেক্ষা করে বিরোধীরা ২০১৮ এর তুলনায় এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভালে লড়াইয়ে ছিল এবং তা ফলাফলে প্রতিফলিত।

যদিও এই ফলাফল যে চূড়ান্ত তা জের দিয়ে বলা যায় না, কারণ ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনার ২০টি বুথে পুনর্নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিরোধীরা কলকাতা হাইকোর্টে তথ্য প্রমাণ-সহ প্রায় ৬০০০ হাজার আসনের কারচুপি উল্লেখ করে মামলা দায়ের করেছেন এবং তার পরবর্তী শুনানি ধার্য হয়েছে ২০ জুলাই। প্রথম দিনে মহামান্য হাইকোর্ট উল্লেখ করেছেন ওই ৬০০০ আসনের বিজয়ী প্রার্থীদের উল্লাসের কোনো কারণ নেই। তাদের জয় পরাজয়ের ভাগ্য নির্ভর করবে হাইকোর্টের রায়ের উপর। দুর্ভাগ্যক্রমে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষের জীবনহানি, অঙ্গহানি, সম্মানহানি ও গৃহহানি রুখতে জনগণকে প্রতিনিয়ত আদালতের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। বিরোধী দলনেতা আদালতে আরও অভিযোগ করেছেন জয়ী বিজেপি প্রার্থীর পরিবর্তে বিডিয়োরা শাসকদলের পরাজিত প্রার্থীকে শংসাপত্র দিয়েছেন। তাছাড়া বুথ দখল করে বিরোধীদের এজেন্টদের গণনাস্থল থেকে মারধর করে বের করে দিয়ে ব্যালট ছাপ্পা ভোট দেওয়া হয়েছে। শাসকদলের শাসানিতে গণনাস্থলে এক মহিলা প্রিসাইডিং অফিসারকে সোশ্যাল মিডিয়ায় কাঁদতে দেখা গিয়েছে এমনকী শাসক দলের সন্ত্রাসে এক প্রিসাইডিং অফিসার গণনাকেন্দ্রের মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে মারা গেছেন। যার ফলে বর্তমানে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল অনেকটাই হাইকোর্টের বিচারাধীন রয়েছে। দেখা গেছে যখন কোনো রাজনৈতিক দল সমাজবিরোধী, মাফিয়া ও দুর্নীতিগ্রস্তদের দখলে চলে যায়, তখনই হিংসা, সন্ত্রাস ও খুনোখুনি বৃদ্ধি পায়। তারই প্রতিফলন ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ও সমাজজীবনে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে হিংসায় ৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ২০২৩ সালের নির্বাচনে এখনও পর্যন্ত ৫৪ জনের মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু বিস্ময়কর সিপিএম ও কংগ্রেসের নীচুতলার কর্মীর নির্বাচনী হিংসায় মৃত্যু হলেও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ করার সাহস দেখান না। কারণ কী বিরোধী ঐক্যের সেটিং? এমনকী এরাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্ব নেতৃত্ব সংবিধানের ধারা ৩৫৫,৩৫৬ দাবি করলেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কি সমর্থন করবে? তাদের জোটসঙ্গী সিপিএম নাকি ৩৫৫,৩৫৬ ধারা প্রয়োগের বিরোধী। সেজন্য জনগণ চাইলেও প্রথমেই এই দলগুলো তৃণমূলের সঙ্গে ৩৫৫,৩৫৬ ধারা প্রয়োগের তীব্র বিরোধিতা করবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। পশ্চিমবঙ্গ আজ শিল্প, অর্থনীতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে পিছনের সারিতে এবং হিংসায় প্রথম স্থানে। পশ্চিমবঙ্গে হিংসা ও সন্ত্রাসের রাজনীতি বন্ধ করতে হলে, যারা ক্ষমতা কায়েম রাখতে লাশের উপর রাজনীতি করে, তাদের বয়কট করতে হবে এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে জনমত গড়ে তুলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। নতুবা ইতিহাসের পাতায় বাঙ্গালি হিংসায় উন্মত্ত এক জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। বলতে দ্বিধা নেই, মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে বেঁচে থাকলে নিশ্চিত অনুতপ্ত হতেন এবং তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি (What Bengal thinks today, India thinks tomorrow) ফিরিয়ে নিতেন।

এই রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতির নিরিখে কবি শঙ্খ ঘোষের ‘সবিনয় নিবেদন’ কবিতাটির উল্লেখ খুবই প্রাসঙ্গিক হবে—

‘আমি তো আমার শপথ রেখেছি
অক্ষরে অক্ষরে
যারা প্রতিবাদী তাদের জীবন
দিয়েছি নরক করে।
দাপিয়ে বেড়াবে আমাদের দল
অন্যে কবে না কথা
বজ্র কঠিন রাজ্য শাসনে
সেটাই স্বাভাবিকতা।
গুলির জন্য সমস্ত রাত
সমস্ত দিন খোলা
বজ্র কঠিন রাজ্যে
এটাই শান্তিশৃঙ্খলা।
যে মরে মরুক, অথবা জীবন
কেটে যাক শোক করে,
আমি আজ জয়ী, সবার জীবন
দিয়েছি নরক করে। ■

প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি

শতদ্রু সিনহা রায়

ভোট নামক একটি প্রহসন হয়ে গেল আমাদের রাজ্যে। অনেকে আমাদের দেশকে বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ। যেখানে দেশের শত কোটি গণদেবতা তাঁদের প্রতিনিধি বেছে নেন দেশকে চালিত করার জন্য। সাধারণের প্রতিনিধি হয়ে, জনপ্রতিনিধিরা দেশের কল্যাণ ও হিতে নিজেদের জনসেবক রূপে উৎসর্গ করবেন। মানুষের জন্য ভালো চিন্তা করবেন। দেশের প্রতিটি মানুষ যেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্ন, বাসস্থান ও পরিধান পায়, সেটা নিশ্চিত করবে। দেশকে বিশ্বের সামনে মাথা উঁচু করে চলার জন্য সবরকম ভাবে চেষ্টা করবে। এছাড়াও দেশের প্রত্যেক মানুষের সংবিধান বর্ণিত যে অধিকার আছে, সেই অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবেন। সর্বোপরি, দেশের জনগণ, গণদেবতারূপী ভোটারদের রায়কে মাথা পেতে নেবেন। সেটাই ভারতের চিরাচরিত রীতি। এমনটাই আশা করেন সাধারণ মানুষ।

স্বাধীনতার প্রাপ্তির পর ৭৫ বছর পেরিয়ে ৭৬-এ পা দিতে চলল ভারত। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে যখন সারা ভারত জুড়ে স্বাধীনতার অমৃত কাল পালিত হচ্ছে, সেই পুণ্যক্ষণে সারা দেশ প্রত্যক্ষ করল এক কলঙ্কিত অধ্যায়। আর সেই অধ্যায়ের রচয়িতা, আমাদের রাজ্য, এই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার। মা, মাটি, মানুষের সরকার। সাক্ষী হয়ে থাকলাম আমরা ভোট কর্মীরা। আর সাধারণ মানুষ মানে গণদেবতারা।

গণদেবতার ঈশ্বর সাধনার এক মহাযজ্ঞে শামিল হয়েছিলাম এই বছর। পঞ্চায়েত নির্বাচনের একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের একজন পরিচালক অর্থাৎ প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পেয়েছিলাম নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে। আমাকে এই দায়িত্ব দেবার জন্য আমি গর্বিত।

এই নির্বাচনের প্রাক্কালে অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনা একের পর এক ঘটতে থাকায় মনে যে কিঞ্চিৎ দোলাচল ছিল না যে তা নয়। আমার আত্মীয়, পরিজন থেকে বন্ধু-বান্ধব, সেদিন মানে ৭ জুলাই ভোট গ্রহণের জন্য বাড়ি থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে যখন রওনা দিচ্ছি, আমার সন্তান, স্ত্রী, মা, বোনেরা ঈশ্বরের কাছে একটাই প্রার্থনা করতে থাকে, যেন সুস্থ ভাবে বাড়ি ফিরে আসি। মনে মনে ভাবি, একজন সরকারি কর্মচারী, আবার প্রাইমারি মানে প্রায় মরা শিক্ষক, তাঁর মরা আর বাঁচা! কারোরই কিছু যায় আসে না। সরকারের কাছে কিছু দাবি করলে নানা পশুর সঙ্গে তুলনা করে সম্মানিত করা হয়। পদোন্নতি নেই, সামান্য মহার্ঘ্য ভাতা নেই। এই দুর্মূল্যের বাজারের নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। তাসত্ত্বেও একজন দায়িত্বশীল সরকারি কর্মী হিসেবে মা, মা, বলে রওনা দিলাম ডিসিআরসি-র দিকে। প্রায় ঘণ্টা আড়াই বাদে পৌঁছালাম সেখানে। কলকাতা থেকে সামান্যই দূরত্ব। অনেকের কাছে আবার এটাই বেশ খানিকটা দূরত্বের। তাঁদের এখানে এসে পৌঁছাতে একটু দেরি হলো।

ডিসিআরসি-তে পৌঁছেই প্রথম কাজ হলো ডি কোডিং করে নিজের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের (বুথের) নামটা জেনে নেওয়া, এরপর উপস্থিতি, মোবাইল রেজিস্ট্রেশন সেরে, আমার টিম মেম্বার বা আমাদের অন্য চারজন পোলিং অফিসারের জন্য অপেক্ষা করা। তাঁরা সবাই এলেন। অবাক ব্যাপার লাগল, অন্য টিমের বহু প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসার অনুপস্থিত। তাঁদের টিম পাগলের মতো ট্যাগিং-এর জন্য অধিকারিকদের হাতে পায়ে ধরতে শুরু করতে থাকে। এদিক-ওদিক দৌড়াতে থাকে। কারণ একটাই, প্রত্যন্ত অচেনা জায়গা, কেমন তার পরিবেশ, ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের অবস্থা কেমন? রাজনৈতিক লড়াইটা কেমন পর্যায়ে রয়েছে? স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক? সর্বোপরি ত্রিস্তর, মানে গ্রাম-পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ভোট গ্রহণ। গড়ে হাজারের ওপর ভোটদাতা। তার থেকেও বড়ো চিন্তা, কাগজের ব্যালটে ভোট। সবকটি ব্যালটে সই করতে হবে প্রিসাইডিং অফিসারকে। সময় সাপেক্ষ, অন্য কাগজ বা ফর্ম তো আছেই, আছে বুথ সাজানো। সব মিলিয়ে এক দক্ষযজ্ঞের মতো ব্যাপার।

আমাদের টিমের সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল। ধাক্কা খেলাম, যখন আমার বুথের সাড়ে বারোশো ভোটারের জন্য অতিরিক্ত এক ভোটিং কম্পার্টমেন্ট ও অতিরিক্ত পোলিং অফিসার চাইতে গেলাম। আধিকারিক, যারা দায়িত্বে ছিলেন, মুখের ওপর না বলে দিলেন। আরও বললেন, যে এই কজন মিলেই ওই বিশাল ভোটারদের সামলাতে হবে। বিফল হয়ে, পুরোটাই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের ওপর ছেড়ে দিলাম। আর তো কেউ নেই, যে তাঁর ওপর নির্ভর করব। আমার টিম

মেম্বাররা একটি এমন ঘটনার জন্য আরও দিশেহারা হয়ে পড়লেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও বড়ো ধাক্কা দিল। পুলিশ ট্যাগিং করতে গিয়ে। দেখলাম, আমার বুথটি সরকারি পরিভাষায় স্পর্শকাতর। ভেবেছিলাম একটু বেশি সুরক্ষা বলয় দেওয়া হবে আমাদের জন্য। বাস্তবে সেই ভুল ভাঙল, যখন মাত্র একজন বৃদ্ধ রিভলবারধারী কলকাতা পুলিশের কর্মীকে আমাদের সুরক্ষার জন্য দেওয়া হলো। যখন বললাম যে মাত্র একজন। যিনি আধিকারিক ছিলেন, তিনি বললেন, এর বেশি পাবেন না। নিলে নিন, না হলে নির্বাচন পরিচালনা যারা করছেন তাঁদের কাছে গিয়ে জানান। আবার গেলাম আধিকারিকদের কাছে। তিনি ভদ্রভাষায় যা বললেন, সেটার থেকে চারটি খিস্তি দিলে সম্মানিত বোধ করতাম।

এরপর আসে গাড়ি ট্যাগিং। একটি বড়ো অটো রিক্সাতে চারটি ভোট গ্রহণের বাক্স, বিশাল কাগজ পত্র-সহ তিনটি ব্যাগ, ব্যালট পেপার, আমরা (চালক-সহ) ছয় জন মানুষ, আর তাঁদের ল্যাগেজ। বোঝার চেষ্টা করুন, কী দুঃসহ অবস্থা। ডিসিআরসি থেকে ঘণ্টা খানেকের রাস্তা। এভাবেই প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায় আমাদের যাত্রা শুরু। মূল রাস্তা থেকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের দূরত্ব মাত্র চার কিলোমিটার। অটো যাবার মতো রাস্তাও নয় এটা। মাঝে মধ্যেই দুর্বল কালভার্টের জন্য আমাদের সবাইকে নেমে যেতে হচ্ছিল। পাশে আবার পুকুর নয় পচা ডোবা। যদি কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে, তাহলে আমরা এই গ্রাম থেকে যে বেরোতে পারব না, সেটা টিমের সবাই জেনে গিয়েছিল। আরও আতঙ্ক মনে চাপা বাসা বাঁধছিল। যখন আমাদের কানে আসছিল ভারী ভারী পটকার আওয়াজ। আমাদের অটোর যিনি চালক, তিনি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে আমাদের সাবধান করে বললেন, 'স্যার, কোনো ঝুট ঝামেলাতে যাবেন না। ওই যে আওয়াজগুলো শুনছেন, ওগুলো সব বোমার আওয়াজ। গ্রামের মধ্যে মারা হচ্ছে। ভয় দেখানোর জন্য। যেখানে বিরোধী দলের কিছু মানুষ আছে সেই সব গ্রামে একটু বেশি'। দিনের আলো ফিকে হচ্ছিল। আমাদের মনটাও একটু যে দুর্বল হয়ে পড়ছিল না তা নয়। ইতিমধ্যে পাশ দিয়ে কুড়িটি বাইকের একটি দল চলে গেল। অটোচালক বললেন, এরা সব শাসক দলের লোক। এই এলাকা পুরোটাই ওদের কবজায়। এই দলে বহু অপরিচিত মানুষজনও আছেন। যারা গ্রামের মানুষদের চেনে না। আর এই এলাকায় মানুষ খুন জলভাত। আবারও বললেন সাবধান থাকবেন। তর্কা- তর্কিতে একেবারেই যাবেন না। একটি খুব দামি কথা ওই অটোচালক বললেন, আপনারা সবাই বায়বীয় হবেন, চোখ দিয়ে শুনবেন, আর কান দিয়ে দেখবেন। আমাদের গোটা টিম ওই অটো চালকের কথাটি প্রথমে মানতে না চাইলেও পরে মানতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আমরা একটি পুকুরের পাশ পর্যন্ত সরু রাস্তা ধরে গেলাম। আর বর্তমান রাজ্যে সরকারের উন্নয়নের ধারাকে প্রত্যক্ষ করলাম। পুকুরের পাশের বেশ খানিকটা রাস্তা পেরিয়ে স্কুল বাড়িটা দেখিয়ে দিল গ্রামবাসীরা। সদ্য নতুন ইট পেতে ভোটের জন্য রাস্তা তৈরি হয়েছে। ওই রাস্তায় যে পুরু কাদার প্রলেপ ছিল, তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। যাইহোক, আমরা স্কুল বাড়িতে পৌঁছালাম। আপ্যায়ন হলো বেশ। আমরা আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে স্কুলে ঢুকে দেখি, আমাদের যেখানে ভোট গ্রহণ করা হবে, সেখানে মিটিং চলছে। কাদের মিটিং? কীসের মিটিং? সেসব জেনে ছিলাম একটু পরে। ঘরটা ছেড়ে দিতে বলায়, তাঁরা বললেন, এখানে শান্তিতে ভোট হবার একটা চিরাচরিত রেওয়াজ আছে। সে মতোই হবে। আমাকে বলা হলো চিন্তা না করতে। ওদিকে যিনি দলবল নিয়ে মিটিং করছিলেন, তিনি সবাইকে নিয়ে ওপরে মানে ছাদের ঘরে চলে গেলেন। একটু পরে নেমে এসে বললেন, এখানে আমরা, মানে শাসক দলের লোক ছাড়া কেউ নেই। অন্যেরা এজেন্ট পর্যন্ত দেয় না। কেননা, তাঁদের এজেন্ট দেবার মতো লোক পাওয়া যায় না। আরও বললেন যে তাঁদের দলের লোকেরা আমাদের খাওয়াদাওয়া থেকে সব কিছু দেখবে, এমনকী নিরাপত্তার ব্যাপারটিও। আমরা বললাম, খাবার খরচাটা আমরাই দেব। কেননা সরকার আমাদের দিয়েছে। যাকে খাবারের

ফঃ ৪

দায়িত্ব দেওয়া, তিনি বললেন, আমি এই স্কুলে মিড ডে মিল রান্না করি, আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। এটা আমাদের কর্তব্য।

ঘরে পর্যাপ্ত আলো নেই। ইতিমধ্যে সিসি ক্যামেরা লাগানো হলো। আবার সেই ক্যামেরার মুখ ঘুরিয়েও দেওয়া হলো। তখনই বুঝতে পারলাম কী হতে চলেছে। বাইরে বাথ রুম। পাশে পুকুর। আলো নেই বলা হলে, সঙ্গে সঙ্গে তিনটি আলো লাগিয়ে দেওয়া হলো।

রাত তখন আটটা। আমরা কাজ একটু এগিয়ে রাখছিলাম। একটা বাইক বাহিনী আমাদের খোঁজ খবর নিতে এল। তাদের নেতার সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে। তিনি একটু আভাস দিয়ে বললেন, আমরা যেন তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করি। আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, একশো শতাংশ করব। বাইরে তখন সেন কালীপুজোর রাত। মুহূর্মুহু বোমার আওয়াজ। আমাদের সঙ্গের পুলিশ কর্মী আবার বিশ্লেষণ করে গুলির আওয়াজ নির্দিষ্ট করে দিচ্ছিলেন। মনে মনে ভাবছিলাম যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পড়লাম বোধহয়। ইতিমধ্যে একজন আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলেন। তিনি আবার ব্যাঙ্গালোরে কাজের সূত্রে থাকেন। এবারই প্রথম গ্রামে এসেছেন ভোট দিতে। তিনি কী কারণে এসেছেন, সেটা পরে বুঝলাম। তিনি সুন্দর গল্প করে, আমাদের মনের ভয়ের মাত্রাটাকে আরও বাড়িয়ে দিতে চাইলেন। আরও জানিয়ে দিলেন যে এখানে যারা আমাদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলে গেলেন, তাঁদের সবার কাছেই মানুষ মারা জলভাতের মতো। এটা অবশ্য প্রথম সাক্ষাতের সময় কোমরের কাছে থাকা ছোট্ট একটি যন্ত্রের উঁকি দেওয়া দেখে বুঝেছিলাম।

রাত দশটা, চারিদিকে ঘুটঘুটি অন্ধকার। গুটিসুটি মেরে দুজন মানুষ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। পরিচয়পত্র দেখিয়ে নিজেদের বিরোধী দলের প্রার্থী বললেন। আবার ভূতের মতো উবেও গেলেন।

আবার বাইক বাহিনী এসে খোঁজ নিয়ে গেল। কে কে এসেছিল দেখা করতে, সেটাও জানতে চাইল। যা সত্যি তাই বললাম। আবারও শান্তির বাণী।

রাত বারোটা, বাইক বাহিনী একবার এরাশে যায়, তো কিছুক্ষণ পর ওপাশে। এবার গোলাগুলির আওয়াজ নিকটবর্তী। পরে জানলাম এগুলি গ্রামবাসীকে ভয় দেখাবার জন্য করা হচ্ছিল। চলেছিল প্রায় সারারাত। আমরাও একটা বেপরোয়া ভাব মনের মধ্যে এনে, যা হবার হবে, দেখা যাক।

সকাল সাড়ে চারটা থেকে রেডি হতে থাকলাম সবাই। ওরাও পাঁচটা দশের মধ্যে হাজির। কিছু ভোটারও লাইন দিয়েছেন।

সকাল ছয়টায় রাজনৈতিক দলের পোলিং এজেন্টদের ১০ নম্বর ফর্ম জমা নিয়ে নিলাম। দুজন শাসক দলের, একজন বিরোধী দলের। যদিও পরে বুঝেছিলাম তিনিও শাসক দলের। এবার ব্যালট বক্স খুলে ফাঁকা দেখিয়ে, সিল করে, ঠিক সাতটায় ভোট শুরু হলো। ইতিমধ্যে বিশাল লাইন পড়ে গেছে। অন্যদিকে ভোটের ঘরে অবাধ যাতায়াত বেড়ে গেছে অবাঞ্ছিত মানুষ জনেদের। বারণ করলেও শুনছে না। আসলে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ভোট দিতে আসা মানুষদের ভয় দেখাতেই, বুথের ভিতর এরা। আমার বারণ করার উত্তরে বেশ ভদ্র ভাবেই বলল, আপনি আপনার কাজ করুন। আমরা তো ডিস্টার্ব করছি না। একজনের গলায় আবার নির্বাচন কমিশনের দেওয়া কার্ড ঝুলছে। দু' ঘণ্টা ভোট চলার পর কার্যত আমাদের কাজ ওদের মতোই করতে হবে, সেটা বুঝে গিয়েছি। তবুও সাধারণ মানুষ যাতে তাঁদের ভোট দিতে পারে সেটা নিশ্চিত করার সামান্য চেষ্টা করে গেলাম। তাতেও বিপত্তি। এবার চলল সঙ্গে গিয়ে ব্যালটে ছাপ দেবার পালা। ভোটার কাগজ নিচ্ছেন। আর ছাপ দিচ্ছে শাসক দলের মানুষজন। চলল আরও দু ঘণ্টা। নীরব দর্শকের মতো যন্ত্রবৎ ব্যালট ইস্যু থেকে সব কাজ করে যেতে হলো আর এক ঘণ্টা। ভোটের হার বেশ কম। এটা দেখে, নিজেরাই ব্যালট ছিঁড়ে, কাউন্টার ফয়েলে আঙুলের ছাপ দিয়ে, একটা একটা করে ভোটার লিস্ট থেকে নাম্বার লিখতে থাকল। আমরা খালি ভোটার স্লিপটা কাটতে থাকলাম। দুপুর তিনটের পর আবার বাইক বাহিনী। আমাদের কাছে এসে বলল, অন্য সব জায়গায় ভোট শেষ। আপনি এখনও চালাচ্ছেন?

আমি বললাম, ভাই আপনার লোকেরাই তো শেষ করতে পারছে না। পাশের ঘরে, তখন জনা ত্রিশেক লোক। কেউ গামছায় মুখ ঢাকা, আবার কারুর গলায় গামছা। দুটো ব্যাগে ভর্তি বোমা। ঠিক আমার টেবিল থেকে হাত দশেক দূরে। তিনজন আবার হাতের যন্ত্রটিকে গামছা দিয়ে মুছছে। আমি ওই নেতাকে বললাম, ভাই তোমাদের তো জনা চল্লিশেক লোক আছে, তাদেরও কাজে লাগাও। বাক্স ভর্তি করে দাও। এবার তারাও নেমে পড়ল। কিন্তু বিভ্রাট, তাদের মধ্যে আবার জনা দশেক শাসক দলের সিম্বলই চেনে না। এবার হাপিয়ে উঠল সবাই। পাঁচটা। আমি বললাম এবার আমাদের ছাড়ুন। উত্তরে এল সব জায়গায় ভোট রাত্রি আটটা পর্যন্ত হবে। আমাদের এখানেও হবে। জনা দশেক স্কুলের গেট আটকে দিল। আমি ঠাণ্ডা মাথায় বললাম, ভাই, তোমরা লোক নিয়ে এস। আমি রাত্রি দশটা পর্যন্ত ভোট নেব। এবারে কিছুটা বেকায়দায় পড়ল তাঁরা। বুঝল আর রক্ষা করা যাবে না। নেতাকে ফোন করে আমাকে ধরিয়ে দিল।

আমি বললাম, আপনিই তো বলে গেলেন ভোট তিনটের সময় শেষ হয়ে গেছে। তাহলে আবার দশটা কেন? আপনার লোকেরা সুযোগ পেয়েও, নিতে পারল না। সেটা কি আমাদের দোষ? এবার ওই পাড়ার কিছু শিক্ষিত মানুষ এসে আমাদের পাশে দাঁড়ালেন। জানালেন প্রাক্তন সদস্য ছিলেন, কেউ শিক্ষক। আমাদের টার্গেট ছয়টার মধ্যে এলাকা ছাড়ব। ব্যালট বক্স সিল করেই পালাব। বাকি কাজ ডিসিআরসিতে বসে করব। ওই বয়স্ক মানুষেরা ব্যালট বক্স সিল করার ব্যবস্থা করে দিলেন। ফর্ম ১৮ ফিলআপ করে দিয়ে, অটোতে চাপতে যাব, একজন অবসর প্রাপ্ত মাস্টারমশাই আমাদের অনুরোধ করলেন, তাঁর বাড়ি রাস্তায় পড়বে, যদি নামিয়ে দিই। আমরা নিয়ে নিলাম। পিছনে বাইক বাহিনী আসছে। বড়ো রাস্তায় উঠে মাস্টারমশাই বললেন, আপনাদের নিরাপদ জায়গায় ছেড়ে দিয়ে গেলাম। আপনাদের আর চিন্তা নেই। এই বাক্স তিনটে ওরা কেড়ে নিত। আপনাদের মারধর করত। আমি সঙ্গে থাকাতে সেটা করতে পারল না। আমার ছেলে শাসক দলের বড়ো নেতা। তাই ওরা মান্যি করে।

ডিসিআরসিতে ফিরে একরাশ বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। আর এবারের পঞ্চায়েত ভোটের এক সুখস্মৃতিকে চিরতরে ভুলে যাবার শপথ নিলাম আমাদের টিমের সবাই। সবশেষে প্রিসাইডিং অফিসার ডায়েরিতে লিখে দিলাম কিছুই হয়নি। জমা পড়ে গেল ব্যালট বক্স। ■

সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৫ জুন সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার আলিপুরস্থ জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাষা ভবনে। সকাল ১০টায় সংস্কার ভাবসংগীত দিয়ে সভার শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ডঃ ধনঞ্জয় কুশরে, কেন্দ্রীয় সম্পাদিকা তথা প্রদেশ সহ সভানেত্রী শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়, কেন্দ্রীয় কোষ টোলির সদস্য ও প্রান্ত পরামর্শদাতা ভরত কুণ্ডু, শিক্ষাবিদ তথা প্রদেশ সভাপতি ডঃ স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ, প্রদেশ সহ সভাপতি ডঃ স্বপন মুখার্জি, প্রদেশ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সুভাষ ভট্টাচার্য, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ বিজ্ঞানী ডঃ জিষ্ণু বসু, অভিনেতা কৌশিক চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সন্তুর বাদক পণ্ডিত তরুণ ভট্টাচার্য এবং প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত।

সভায় বার্ষিক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন যথাক্রমে সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত এবং কোষাধ্যক্ষ গোপাল কুণ্ডু। সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদিত হয়। এর পর শ্রীকুশরে বাংলাভাষায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমানে ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য নানাভাবে কুঠারাঘাত নেমে এসেছে। তাই আমাদের সকল স্তরে জাতীয়তাবোধের জাগরণের জন্য কাজ করে যেতে হবে। আমাদের ওপর যে সাংস্কৃতিক আক্রমণ চলছে তার প্রতিরোধ করতে সংস্কার ভারতীকেই এগিয়ে আসতে হবে।

সভায় মুখ্যত তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ

(১) পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রাচীন মন্দিরগাত্রের পুরাকীর্তির ইতিহাস ও তথ্য সংগ্রহ করবে সংস্কার ভারতী এবং সংগৃহীত তথ্য পঞ্জীকৃত করবে। সেই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের কাছে প্রাচীন পুরাকীর্তির ইতিহাস তুলে ধরতে তথ্যচিত্র নির্মাণ করবে।

(২) বঙ্গপ্রদেশের আদি শাস্ত্রীয় সংগীত হলো কীর্তন। সেই গৌড়ীয় কীর্তনের ইতিহাস পুনরুদ্ধার এবং তার গবেষণা করছে সংস্কার ভারতী পরিবার। আগামীদিনে শাস্ত্রীয় সংগীত হিসেবে কীর্তনের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি সনদ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় সাংস্কৃতিক সংগঠন সংস্কার ভারতী।

(৩) নাটক সম্পর্কে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি উক্তি বাংলায় বহুল প্রচলিত— 'থিয়েটারে লোকশিক্ষা হয়'। অর্থাৎ নাটক একটি এমন মাধ্যম যা জনমানসে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে। সুতরাং নাট্যকার, নাট্যশিল্পীদের বিশেষ দায়িত্বশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে বহু উন্নতমানের নাট্যগোষ্ঠী আছে। সংস্কার ভারতীর প্রস্তাব, সেই নাট্যগোষ্ঠীগুলি তাদের মঞ্চ উপস্থাপনায় এমন বিষয় রাখুন যা আগামীদিনে ভারতীয় সমাজকে উন্নত করবে এবং মানসিকভাবে সমৃদ্ধ করবে। নাটকের সংলাপ বাস্তবমুখী হবে নিশ্চয়ই কিন্তু তা কুরুচিকর হবে না। শিল্পী থেকে লেখক, পরিচালক সকলেই সমাজ ও দেশের প্রতি এই দায়বদ্ধতা স্মরণে রাখবেন। সভার দ্বিতীয় পর্বে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ দ্বারা আয়োজিত 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও বন্দে মাতরম্' শীর্ষক একটি আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন প্রতিনিধিরা। প্রান্ত সংগীত বিধা প্রমুখ তনুশ্রী মল্লিকের রচনা ও পরিবেশনায় সংগীতালেখ্য 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' পরিবেশিত হয়। পরিবেশিত হয় প্রান্ত সহ সাধারণ সম্পাদক অমিত দে-র পরিচালনায় বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসের নির্বাচিত অংশ নিয়ে একটি শ্রুতিনাটক 'বন্দে মাতরম্'। এই পর্বে আলোচনায় অংশ নিয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ জিষ্ণু বসু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আনন্দমঠের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে ১৭৭৬ সালের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যা করেন এবং বন্দে মাতরম্ ধ্বনি কীভাবে পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয়তাবোধের মন্ত্র হয়ে উঠেছিল তার বিশদ বর্ণনা করেন। শান্তিমন্ত্রের পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মেদিনীপুরে নিবেদিতা সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

সেবা ও ত্যাগের প্রতিমূর্তি ভগিনী নিবেদিতাকে স্মরণ করে গত ২ জুলাই মেদিনীপুর শহরের শ্যাম সঙ্ঘ ভবনে নিবেদিতা সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন কর হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবক বজরঙ্গলাল আগরওয়ালা। উপস্থিত ছিলেন শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুহাস রঞ্জন মণ্ডল, হৃষিকেশ দে, চিত্তরঞ্জন কুণ্ডু ও অনুময় ঘোষ। নিবেদিতা সেবা ট্রাস্টের সদস্য দেবাশিস সিংহ ও শ্রীমতী কুহেলি দত্ত-সহ ৫০ জন রক্ত দান করেন। প্রত্যেক রক্তদাতাকে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে স্মারক ও শংসাপত্র দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। ট্রাস্টের সদস্য কনক কুমার পাণিগ্রাহী জানান, রক্তদান শিবির ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে শুরু হলো আমাদের পথ চলা। আগামীদিনে নিবেদিতা সেবা ট্রাস্ট আরও অনেক সমাজ কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে যাবে।

সিউড়ি শহরে শ্যামাপ্রসাদ জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ৬ জুলাই সিউড়ি শহরের শ্যামাপ্রসাদ মোড়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মর্মর মূর্তির পাদদেশে ড. শ্যামাপ্রসাদ জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নবীন সন্ন্যাসী স্বামী শিবসনাতন মহারাজ প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। শহরের বহু বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে ডঃ মুখার্জির মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ড. শ্যামাপ্রসাদের জীবন ও কর্মের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্বপন সেনগুপ্ত ও নির্মল চন্দ্র মণ্ডল। মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ শিবাজীপ্রসাদ মণ্ডল এবং জেলা সঙ্ঘচালক তোলারাম মণ্ডল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বীরভূম জেলা শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। রাষ্ট্রবন্দনার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

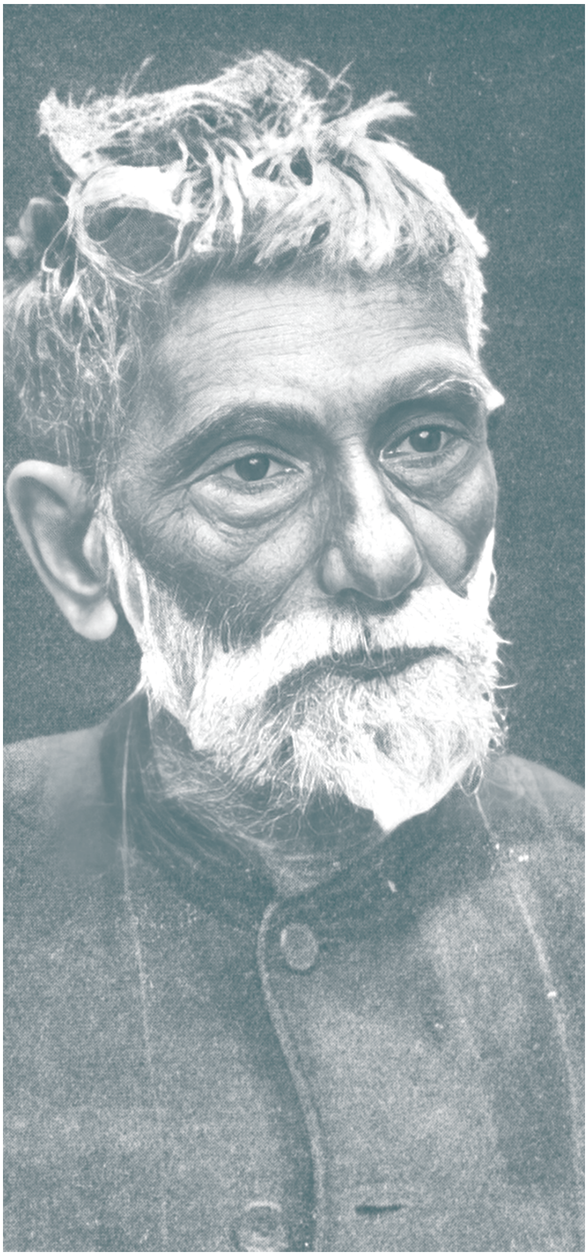

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়
ভারতীয় রসায়নের ঋষি

অধ্যাপক (ড.) স্বাগত বোস

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, জাতীয়তাবাদী এবং স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ এক অনন্যসাধারণ বিজ্ঞানী। তাঁর হৃদয় জুড়ে ছিল দেশ তথা এই দেশের মানুষ। একজন জাতীয়তাবাদী হিসেবে তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয়রা যাতে শিল্প বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে। সেই উদ্দেশ্যে দেশবাসীকে শিল্প স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ১৯০১ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় দ্বারা পরিচালিত একটি সফল প্রতিষ্ঠান। এছাড়া বর্তমানে খুলনা টেক্সটাইল মিলসও তাঁর হাতে গড়া। তিনি তরুণদের ভীষণভাবে উৎসাহিত করতেন ব্যবসায় এগিয়ে আসার জন্য। বলতেন কোনো জাতি শুধুমাত্র কেরানি বা মসিজীবী হয়ে টিকে থাকতে পারে না, এগিয়ে যেতে পারে না।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ১৮৬১ সালের ২ আগস্ট বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত খুলনা এবং অবিভক্ত ভারতের যশোর জেলার অন্তর্গত রাড়ুলি গ্রামের এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হরিশচন্দ্র রায় ছিলেন উদার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। তিনি মানুষদের শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার জন্যে নিজের জমিদারির মধ্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শিক্ষার প্রতি হরিশচন্দ্রের এতটাই ভালোবাসা ও আগ্রহ ছিল যে তিনি তাঁর বাড়িতেই একটি বিশাল লাইব্রেরি স্থাপন করেন। সেই লাইব্রেরি সমৃদ্ধ ছিল বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, রাজনীতি ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের বই দ্বারা। গ্রামে থাকাকালীন বালক প্রফুল্লচন্দ্রের জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে এই লাইব্রেরির বিরাট ভূমিকা ছিল। পিতার বিদ্যানুরাগের ছায়া তাঁর উপর ছোটোবেলা থেকেই পড়েছিল। গ্রামে পিতার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় থেকেই প্রফুল্ল চন্দ্রের শিক্ষা শুরু। পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বিখ্যাত হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু কঠিন শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁকে গ্রামে ফিরে আসতে হয়। সেই সময় তিনি পিতার গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়ে বাড়িতেই বিদ্যার্জন করেন। সুস্থ হয়ে ওঠার পর ১৮৭৪ সালে পুনরায় কলকাতায় ফিরে এসে অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হন। তারপর ১৮৭৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি হন।

এরপর ১৮৮১ সালে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে এফএ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে বিএ-তে ভর্তি হন। কিছুদিন পর তিনি গিলক্রিস্ট বৃত্তি পেয়ে স্কটল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা করেন। সেখানে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি-তে ভর্তি হন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে বিএসসি পাশ করার পর সেখানেই গবেষণায় যোগদান করেন। অদম্য উৎসাহে তিনি গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ দু' বছরের মধ্যে তিনি পিএইচডি এবং ডিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল কপার ম্যাগনেসিয়াম শ্রেণীর সম্মিলিত সালফেটের সংযুক্তি পর্যবেক্ষণ। তাঁর গবেষণাপত্রটি উচ্চমানের হওয়ায় তিনি হোপ পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৮৮৮ সালে দেশে

ফিরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। যদিও এই পদে যোগ দেবার আগে তাঁকে ১১ মাস অপেক্ষা করতে হয়। তাঁর মৌলিক গবেষণায় তিনি ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে মারকিউরাস নাইট্রাইট $Hg_2(NO_2)_2$ প্রস্তুত করেন। এছাড়া তিনি ১২টি যৌগিক লবণ বা সল্ট এবং ৫টি থায়োএস্টার ও আবিষ্কার করেন। এছাড়া জৈব নাইট্রাইট, সালফার যুক্ত বিভিন্ন জৈব যৌগ এবং ধাতব লবণের সঙ্গে তাদের বিক্রিয়া, জৈব ফ্লুরিন যৌগ তথা মারকারি যুক্ত জৈব যৌগ তাঁর মৌলিক গবেষণার কাজকে সমৃদ্ধ করে। যদিও মারকিউরাস নাইট্রাইটের $Hg_2(NO_2)_2$ আবিষ্কার তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তবুও একথা বলা যায় এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের একাংশ সন্দিহান ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি শিক্ষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেন। সরল সাবলীল ভাষায় জটিল রসায়নের সূত্র ব্যাখ্যা করার ক্ষমতাই তাঁকে অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই ছাত্র সমাজের মধ্যে শিক্ষক হিসেবে প্রভাব বিস্তার করায়। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে জ্ঞানে বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে ও অন্যান্য বিষয়ে খ্যাতির শীর্ষে ওঠেন।

পরবর্তীকালে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে যোগ দেন। প্রফুল্ল চন্দ্রের কর্মযজ্ঞ শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যে সমবায় সম্বন্ধে আমরা উচ্চ ধারণা পোষণ করি সেই সমবায় আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র। আজ থেকে একশো বারো বছর আগে অর্থাৎ ১৯০৯ সালে তিনি একটি কো-অপারেটিভ ব্যাংক বা সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিক্ষাব্রতী ১৯০৩ সালে তাঁর পিতা হরিশচন্দ্র রায়ের নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৮ সালে পূর্ববঙ্গের বাগেরহাট জেলায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। রসায়নে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ভারতীয় শিক্ষার উন্নয়নে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে ডারহাম, ঢাকা, মহীশূর ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করা হয়। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধিতে সম্মানিত করে। দেশের মানুষের বিপদে শুধু অশ্রু দিয়ে নয়, সমস্ত শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ১৯২১ সালে খুলনার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় যখন সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হলো সরকারি প্রতিনিধি বর্ধমানের মহারাজার অসহযোগিতায়, তখন স্বয়ং প্রফুল্লচন্দ্র দুয়ারে দুয়ারে ত্রাণ সংগ্রহের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করলেন অন্যান্যদের সঙ্গে।

১৯২২ সালে এক ভয়ংকর বন্যায় পূর্ববঙ্গের বগুড়া, রাজশাহি, পাবনা ও অন্যান্য বিস্তীর্ণ অচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের সাহায্যের জন্য 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' গঠিত হয়। বিজ্ঞান কলেজ থেকে তিনি সমস্ত দেশবাসীর উদ্দেশে তিনি ত্রাণের জন্য আহ্বান জানান। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে তৎকালীন মাদ্রাজ রাজ্য (প্রেসিডেন্সি), বোম্বই রাজ্য (প্রেসিডেন্সি) ও ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে বিজ্ঞান কলেজে বা সায়েন্স কলেজ আসতে থাকে অজস্র ত্রাণ সামগ্রী। এমনকী বিদেশ থেকেও সাহায্য আসতে থাকে। এই কমিটির আর একজন সদস্য ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে প্রাচীন ভারতীয়রা জ্ঞানে বিজ্ঞানে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে পরিগণিত হতো। রসায়নে প্রাচীন ভারতীয়দের অবদানের কথা জানার জন্য তিনি সংস্কৃত এবং পালি ভাষা শিখেছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ যেমন পুরাণ, চরক ও শুশ্রুত সংহিতা থেকে রসায়নের অনেক সূত্র সংগ্রহ করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর 'দ্য হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' বইটিতে লিপিবদ্ধ করে ভারতের অতীত গৌরব সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দেন।

প্রফুল্ল চন্দ্র লিখিত বইগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং তথ্যসমৃদ্ধ এই বইটি জন্মভূমির প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও সুপ্রচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অন্তরের অপরিসীম শ্রদ্ধা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। যে গৌরবের স্বীকৃতি থেকে ভারতীয়রা বঞ্চিত ছিল সেই গৌরবের অধিকার তিনি পুনরুদ্ধার করে এনে ছিলেন অতীতের অতল গহ্বর থেকে।

চিরকুমার এই বিজ্ঞানীর নারীদের প্রতি ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি। তিনি তাঁর গ্রামে বিধবাবিবাহ চালু করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন গ্রামীণ সমাজ তাঁর এই মহৎ উদ্যোগের বিরোধিতা করায় শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হতে পারেননি। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং স্বাধীনতার যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা যে রাউলাট আইন প্রণয়ন করে এবং যার সাহায্যে সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ করার ক্ষমতা দেওয়া হয় সরকারকে, তিনি সেই কুখ্যাত রাউলাট আইনের বিরোধিতা করেন। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাঙ্গলায় যে সশস্ত্র ও অহিংস আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এবং যার মাধ্যমে হাজার হাজার বঙ্গবাসী তাদের প্রতিবাদ জানান সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। শোনা যায়, সশস্ত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীদের অস্ত্র ক্রয়ের জন্য তিনি গোপনে অর্থ প্রদান করতেন।

তিনি গোপনে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের গোপন ফাইলে তাঁর সম্বন্ধে লেখা ছিল— 'বিজ্ঞানীর বেশে বিপ্লবী'। আসলে তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক এক ত্যাগী বিজ্ঞানী যিনি বিজ্ঞানের অনুসন্ধান ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে দেশ সেবা করতেন। এটা যে প্রফুল্ল চন্দ্র নিজেও বিশ্বাস করতেন তা তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে ছিলেন। তাঁর জীবনযাপন ছিল সহজ সরল ও অনাড়ম্বর। ১৯৪৪ সালের ১৬ জুন ভারতীয় রসায়নের এই সন্ন্যাসী ধরাধামের মায়া কাটিয়ে চির বিদায় নেন। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকার মানবদরদি এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর জন্মভিটা ও তৎসংলগ্ন জমি অধিগ্রহণ করে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করেছে। ◻

জগদ্‌গুরু ভারত

ডাঃ দিলীপ কুমার সরকার

প্রাচীন ভারত সবদিক থেকে সমৃদ্ধশালী ছিল। শিক্ষাদীক্ষা, শৌর্যে, বীর্যে, গুণে, জ্ঞানে ও ঐশ্বর্যে জগৎজুড়ে খ্যাত ছিল। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা পড়তে আসতেন ভারতে। বিশ্বের প্রাচীনতম তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ভারতে। বর্তমানে পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় এই জগৎ খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যাপক উন্নতির জন্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি জগৎজুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল। খ্যাতনামা চিকিৎসক জীবক তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন, তেমনই পাণিনি, কৌটিল্য এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা বিশ্ব থেকে প্রায় ১০ হাজার ছাত্র বিদ্যা অর্জন করার জন্য ভারতে আসতেন এবং প্রত্যেকে কমপক্ষে আট বছর সেখানে থেকে পড়াশোনা করতেন।

তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৬৮টি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। এছাড়াও পড়ানো হতো বেদ, সংস্কৃত ভাষা, শিল্পকলা, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত, রসায়ন, যুদ্ধবিদ্যা। তক্ষশীলার পাশাপাশি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল প্রাচীন ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়। খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র।

বিদেশি পর্যটক হিউয়েন সাঙ উচ্ছসিত প্রশংসা করেছিলেন ভারতের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছিলেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে একশোটি ভাষণকক্ষ ছিল। ছাত্রাবাস, ধ্যানকক্ষ, শিক্ষার সমস্ত উপকরণই সেখানে ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১০ হাজার ছাত্র ও ২ হাজার শিক্ষক নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক ভবনটি ছিল তার লাইব্রেরি (গ্রন্থাগার) ভবন যেটি ৯ তলা উঁচু ছিল। ওই সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, বৌদ্ধধর্ম, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, শারীরতত্ত্ব বিদ্যা, সংগীত বিদ্যা, চিত্রকলা এই সমস্ত বিষয় পড়ানো হতো।

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে আরও জানা যায়, নালন্দার শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা— সবই ছিল বিনামূল্যে। ব্যয় বহন করতেন দেশের রাজারা। জনসাধারণও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সন্ন্যাসী ও ছাত্রদের জন্য খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র প্রভৃতি দান করতেন।

এখানে মূলত স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রদান করা হতো। শিক্ষালাভের মূল উদ্দেশ্য ছিল 'শুধুমাত্র জ্ঞান লাভ করা'। এই মহাবিহারের মহাচার্য ছিলেন বিশ্রুতকীর্তি শীলভদ্র। সমতটের ব্রাহ্মণ্য রাজবংশের অন্যতম সন্তান এবং তিনিই ছিলেন হিউয়েন সাঙের শিক্ষাগুরু। এছাড়াও বিখ্যাত জার্মান Indologist-Friedrich Max Muller (1823-1900) তাঁর বেদান্ত দর্শন সংক্রান্ত গবেষণার প্রেক্ষিতে এই দর্শনকে the 'acme' of human রূপে অভিহিত করেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় ভারত এক সময়ে জগদ্‌গুরু ছিল। ▯

মন মণ্ডপে মানুষপুজো

অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ

পৃথিবীর সবাই সুখে থাকুক, সকলে আনন্দে থাকুক। সকলে রোগমুক্ত থাকুক, কেউ যেন কখনোও কোনোও দুঃখ না পায়। দৈবেন দেয়ম ইতি কাপুরুষাঃ বদন্তি। যত্নেন কৃতে যদিন সিদ্ধতি কোহত্র দোষঃ।।

ভাগ্যের দ্বারা ফললাভ হয় এটা কাপুরুষেরা বলে থাকেন। তবে যত্নের ও চেষ্টার দ্বারা যদি ফললাভ না হয়, তা হলে কারও দোষ নাই অর্থাৎ তখন ভাগ্যই মানতে হবে। পুণ্যভূমি ভারতের সনাতন হিন্দুধর্ম যে চারটি মূল স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত তা হলো জন্মান্তর, কর্মফল, আত্মার অবিনশ্বরতা ও গুরুপরম্পরা। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ, জগজ্জননী মা সারদাদেবী ও মানব প্রেমিক বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ— এই ত্রিরত্নের বাণী আমরা মেনে চলতে পারিনি। তাই আমাদের আত্মসম্মানবোধ হারিয়ে গেছে। নিজ স্বার্থের নেশায় উন্মাদ হলে 'ফুল-ফল' দিয়ে পুজোপাঠ করলে কী হবে? মা সারদাদেবী বললেন— 'মন্ত্র না নিলে কী পুজোপাঠ করবে? ওতো কেবল ছেলেখেলা'। পুজো করার উদ্দেশ্য হলো— 'মনুষ্যত্ব অর্জন করা, আর পশুত্ব বিনাশ করা।'

মানুষের বিবেক না থাকলে পুজোপাঠ পুতুলখেলা হয়। সূক্তিরত্নাবলীতে কথিত আছে, 'সত্যহীন বৃথা পূজা, সত্যহীন জপ বৃথা, সত্যহীন তপ ব্যর্থং উষরে বপনং যথা।' নমঃ শিবায় শান্তায় গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'যে যতই ধর্মের ভান করুক না কেন, যতই পুজোপাঠ, গোবর-গঙ্গাজল নিয়ে মাতামাতি করুক না কেন, যতই তীর্থস্থানে বেড়াতে বা নেড়তে (নেড়া হতে) যাক না কেন, সত্যনিষ্ঠ যদি সে না হয় তবে ধর্ম তার ত্রিসীমানায় থাকতে পারে না। মানুষকে হতে হবে সত্যাশ্রয়ী। সত্য সর্বজ্ঞ, সত্য পবিত্র। সংশয়চিত্ত মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে নানারকম ধর্মক্রিয়ার আচরণ করে থাকে। এখন পুজো বিবর্তনের ধারায় উৎসবে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ সুরেলিধড়কন।' কারণ, বাক্চতুর, চৌর্যবৃত্তিচিত্ত, জ্ঞানপাপী— এঁদের পুজো নিষ্ফল হয়। তখন অবাঞ্ছিত ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে। সেই জন্যই মানুষ বিভিন্ন রোগব্যধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। সততায় শান্তি আসে। সেই সততার বড়ো অভাব। বর্তমান সময়ে ধর্মও রক্ষা হচ্ছে না। কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমি ভয় করি তারে, যিনি আমার অন্তরে বিরাজিত, বিবেক তাহার নাম। সেই বিবেককে ষড়রিপু খেয়ে নিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষ পয়োমুখম্ বিষকুম্ভঃ। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন— 'কলির মানুষ ওরম্বা কুল' অর্থাৎ ফোঁপরা ঢেঁকি।

রোগাক্রান্ত সমাজের মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। তাদের সবই বাহ্যিক লোক দেখানো। অধিকাংশ মানুষ ধর্মান্ধ বা ধর্মত্যাগী। শুধু সুবিধাবাদী কিছু অধার্মিক মানুষ আছে। অজ্ঞ মানুষের ধর্ম লাভ হয় না। অধার্মিকের অধর্ম। আমরা ভূত হয়ে আছি, তাই পুজোপাঠ সঠিক হয় না। ধর্মপরায়ণ সত্যানুসন্ধানী মন না থাকায় ধর্মলাভ হয় না। চাই— মন মণ্ডপে মানুষপুজো, জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াই হলো ব্রহ্মধর্ম। আমি আর ব্রহ্ম এক। দুয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। যিনি ব্রহ্ম, তিনি আমি। আমি যা, তিনিও তাই। এই দুয়ের মধ্যে ভেদাভেদ করাটা মতিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। সত্য শাঁখের করাত— যেতেও কাটে, আসতে কাটে। কলিতে প্রত্যেকেই কম-বেশি মিথ্যা কথা বলি। এমনকী জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিজীবী, পুণ্যবান, তপস্বী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও মঠের মহান্ত মহারাজ নিজের যশ ও অর্থের জন্য মিথ্যা কথা বলেন। মিথ্যার প্রায়শ্চিত্ত মনুষ্য দেহে হবেই। মহাভারতে আছে 'মিথ্যা কথা অমূল্য জীবনের অপচয়।' মিথ্যা কথা বললে নিজের আত্মার অসম্মান হয়। মিথ্যাকথা বলে লোক ঠকালে শেষ জীবন বড়োই ভয়াবহ হয়। স্বভাবের পরিবর্তন হচ্ছে তপস্যা, যার ফল হচ্ছে দৈবকৃপা। খাঁটি মানুষ বিবেকানন্দ বলেছেন, 'যত বুদ্ধিজীবী তাঁরা সব স্বার্থপর।'

প্রকৃত (শুদ্ধ) মানুষ দুর্লভ। প্রকৃতপক্ষে মানুষ গঠনে বাধা— 'অবাঞ্ছিত বাসনা, সততার অভাব, অহংকার।' যে ব্যক্তি নিজের আত্মার ভালো করতে পারে না, সে অপরের আত্মার ভালো করবে কী করে? চিন্তার পরিবর্তনেই ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। ঐহিক উন্নতি হচ্ছে কিন্তু মানুষের নৈতিকচরিত্রের অবনতি হচ্ছে। আমিত্বের রেখা থেকেই যায়। দেহটাই মানুষ হয়েছে, মনটা কি মানুষ হয়েছে? মন্দিরের বিগ্রহে মাথা ঠুকলেই মানুষ হওয়া যায় না। বিকারগ্রস্ত মনকে যা শিখাবে, মন তাই করবে। রামপ্রসাদের কথায়, 'এমন মানবজমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা।' মানুষের সেবা করা হচ্ছে ঈশ্বরের সেবা। 'সত্যকথা কলির তপস্যা।' তখন সুস্থ দেহে সুস্থ মন ও নির্ভেজাল হাসি হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, 'ভোগান্ত না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না।' মঙ্গলদায়িনী, সৃষ্টিশক্তি ও স্থিতিশক্তিরূপিনী প্রকৃতিকে নমস্কার জানিয়ে স্তব— 'নমঃ দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ— সতত নমঃ।' জীবনটা বেশিদিনের নয়। যা কিছু জানার আছে সব শুষে নিতে হবে, এরকম একটা তাড়না আমাদের মধ্যে নেই। শুধু নিজের স্বার্থের জন্য অপরের ক্ষতি করার মনোভাব। সব জানে কিন্তু নিজের ছাড়া কিছু বোঝে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।' ◻

বঙ্গদেশের সঙ্গে শ্রীরামের যোগ বহু প্রাচীন

ড. অনিল কুমার ঘোষ

মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম আপামর ভারতবাসী তথা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে আরাধ্য পুরুষ। জীবনের লক্ষ্য পূরণ, পুরুষার্থ অর্জন, চরিত্র গঠন, জীবনচর্যা নির্বাহ সবই শ্রীরামের আদর্শ অনুসরণেই ভারতবাসী প্রয়াসী হয়ে থাকে। সম্প্রতি কিছু শ্রীরাম বিরোধী ব্যক্তি এই ভ্রান্ত মত জাহির করছেন যে বঙ্গজীবনের সঙ্গে রামের কোনো যোগ নেই। বাঙ্গলায় রাম বহিরাগত। রামের পূজা অর্চনা বাঙ্গলার বা বাঙ্গালির সংস্কৃতি নয়। এমনকী তারা জয় শ্রীরাম ধ্বনিতেও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এটাকে তারা শুধুই একটি রাজনৈতিক স্লোগান বলে অভিহিত করেন, কোটি কোটি মানুষের আবেগমথিত কণ্ঠস্বর ভাবতে চান না। তাদের মতে শ্রীরাম শুধুই উত্তর ভারতের আরাধ্য। তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ এতখানি উচ্চে অবস্থান করে যে তারা নিজের দেশের গৌরব, তাদের জাতিগত সত্তাও তারা সেই মুহূর্তে ভুলে যান। কিন্তু তাদের এই কথাগুলি সর্বৈব অসত্য। কেননা তারা হয়তো জানেন না অথবা স্বীকার করেন না যে একটা সময় ছিল যখন সমগ্র বঙ্গদেশ ছিল ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা দশরথের অধীন। স্বাভাবিক ভাবে শ্রীরামের সময়েও বঙ্গভূমি কোশল রাজ্যের অধীন ছিল। তাই একথা ভাবা যেতেই পারে, দশরথের আগে ও পরেও বঙ্গদেশ সুদীর্ঘকাল ধরে ইক্ষ্বাকু বংশের রাজাদের রাজ্যসীমার মধ্যেই ছিল। এসব কথা রামায়ণেই পাওয়া যায় যা ৭০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বঙ্গবাসী তথা সারা ভারতবাসীর মুখে মুখে ফিরেছে। এরই প্রভাবে বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্মীয় রীতিনীতিতে, সাধারণের জীবনচর্চায় আমরা শ্রীরামের উপস্থিতি লক্ষ্য করে থাকি। আমার আপনার অস্তিত্বের মতোই সত্য হলো শ্রীরামের সঙ্গে বঙ্গভূমির সম্পর্ক। কীভাবে সে প্রসঙ্গেই এই আলোচনা।

বাল্মীকি রামায়ণে বঙ্গদেশের উল্লেখ :

সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর রাজা দশরথ, বয়স হয়েছে তাঁর। তাই সর্বগুণ সমন্বিত জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরামকে তাঁর উত্তরসূরি করে যেতে চান। তাঁর অমাত্য সকল এবং প্রতিবেশী রাজ্যের রাজাদের সামনে তাঁর ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন। তাদের অনুমতি ও পরামর্শ নিলেন। স্থির হলো শ্রীরাম রাজা দশরথের উত্তরাধিকারী হবেন। এই সংবাদে অযোধ্যাবাসী সকলে খুব খুশি। আকাশে বাতাসে আনন্দের সীমা নেই। রামের রাজ্যাভিষেকের সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে, এমন সময় দশরথের কাছে সংবাদ এল যে এত আনন্দের মাঝেও রানি কৈকেয়ী বিমর্ষ হয়ে আছেন।

ফঃ৫

রাজা গেলেন কৈকেয়ীর কক্ষে তার মনোকষ্টের কারণ জানতে এবং তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতে। আসলে দাসী মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ী রামের রাজ্যাভিষেকের পরিবর্তে তার ছেলে ভরতকে রাজা করতে ইচ্ছুক এবং পথের কাঁটা রামকে দণ্ডকারণ্যে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠাতে চান। এই দুটি বর পাবার পিছনে এক কাহিনি আছে— তা হলো একবার দেবাসুরের যুদ্ধে মহারাজা দশরথ অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন রানি কৈকেয়ী। তখন রাজা দশরথ কৃতজ্ঞতাবশে কৈকেয়ীকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন, রানি সেই বর দুটি যথাসময়ে চেয়ে নেবেন বলেছিলেন। এখন রামের রাজ্যাভিষেকের প্রাক্‌মুহূর্তে দাসী মন্থরার পরামর্শে দশরথের কাছে সেই বর দুটি চেয়ে নেবার ইচ্ছা করলেন, তাই তিনি বিমর্ষ হয়ে আছেন। একথা রাজা দশরথ জানতেন না।

তাই রাজা দশরথ কৈকেয়ীর কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন রানি আলুথালু বেশে মেঝেতে পড়ে আছেন। রাজা গিয়ে তার মাথা তুলে ধরে তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকলেন যে তাকে রাজ্যের সবচেয়ে ভালো বৈদ্যকে দিয়ে চিকিৎসা করাবেন, তার যা কিছু দরকার তাই তিনি তাকে দেবেন, তিনি এই মানসিক কষ্টের কারণ বলুন। রাজা বললেন— 'তোমাকে সুখী করবে এমন যা কিছু প্রয়োজন হবে আমি তাই করবো। আমার রথের চাকা যে যে স্থানে আবর্তিত হয় সেই সব স্থান আমি তোমাকে দিয়ে দিতে পারি, কারণ তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই' (বাল্মীকী রামায়ণ ২.১০.৩৬)। তখনই দশরথ এই বঙ্গদেশ কৈকেয়ীকে উপহার দেবার কথা বলেছিলেন।

শুধু বঙ্গদেশ মাত্র নয়, সেই সঙ্গে আগের দেশগুলি, সিন্ধু, সৌবির, সৌরাষ্ট্র, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী, কোশল দেশের উল্লেখও তিনি করেছিলেন। সেই দেশগুলি ছিল ধনসম্পদে পরিপূর্ণ (বাল্মীকী রামায়ণ ২.১০.৩৭)। ওই সব দেশে পাওয়া যায় ধনসম্পদ বা সোনা দানা, সেই সঙ্গে সেখানে ফলে খাদ্যদ্রব্য যেমন ধান, শাকসবজি ইত্যাদি। শুধু তাই নয় সেখানে পালন করা হয় ছাগল, ভেড়ার মতো বিভিন্ন প্রাণী যা আজও আমরা বাঙ্গলার গ্রাম্যজীবনে পালিত হতে দেখি গৃহপালিত পশু হিসেবে। সেদিনের সংস্কৃতি আজও সমানভাবে প্রচলিত।

বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের ১০ম সর্গের ৩৬, ৩৭ এবং ৩৮তম শ্লোকগুলি যেখানে বঙ্গদেশের উল্লেখ রয়েছে—

বিষ্যামি তব প্রীতিং সুকৃতেনাপি তে শপে।
যাবতা বর্ততে চক্রং তাবতি মে বসুন্ধরা।। (২.১০.৩৬)
প্রাচীনাঃ সিন্ধু সৌবিরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণা পথাঃ।
বঙ্গাঙ্গ মগধাঃ মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশি কোশলাঃ।। (২.১০.৩৭)
তত্র জাতং বহু দ্রব্যং ধনধান্যমজাবিকম।
ততো বৃনিষ্য কৈকেয়ী যদ্যত্বং মনসেচ্ছসি।। (২.১০.৩৮)

কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমান ও ইংরেজদের আক্রমণ ও শাসন এবং তাদের সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির অনেকটাই হারিয়ে গেছে। তাই হয়তো কারও কারও মনে হচ্ছে যে এই বহিরাগত আক্রমণকারীদের সংস্কৃতিটাই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি আর রাম বুঝি-বা বহিরাগত। তাদের মনে রাখা দরকার, রামায়ণ শুধু একটি ঘটনার বর্ণনা মাত্র নয়, তার থেকেও অনেক বড়ো কিছু। বাল্মীকি রামায়ণ হলো প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল যার মধ্যে বঙ্গদেশের স্থান অনেক বড়ো আকারেই রয়েছে।

বঙ্গসাহিত্যে শ্রীরাম :

বাঙ্গলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, জীবনচর্চা, পূজার্চনা সবকিছুর সঙ্গেই শ্রীরামের যোগ হয়েছে এবং তা দীর্ঘকাল ধরেই। বাল্মীকির লেখা সংস্কৃত ভাষায় ছাড়াও রামায়ণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য দেশের আঞ্চলিক ভাষাতেও লেখা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই কৃত্তিবাস ওঝার হাত ধরে আমরা বাংলা ভাষা এবং বিভিন্ন রামায়ণ পাই। কৃত্তিবাসের জীবনকাল ১৩৮১-১৪৬১ খ্রিস্টাব্দ। তার রচনা রামায়ণের নাম 'শ্রীরামপাঁচালি'। কৃত্তিবাসী রামায়ণ লেখা হয়েছিল তুলসীদাসের লেখা রামচরিত মানস লেখার ২০০ বছর আগে। বাঙ্গলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কৃত্তিবাস ওঝার জন্মবার্ষিকী পালনের উদ্যোগে নিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসনকালে বাঙ্গলার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখেছিলেন মেঘনাদ বধ কাব্য। বাঙ্গলার এক বিখ্যাত নাট্যকাব্য হিসেবে এবং বাঙ্গলার সংস্কৃতির সঙ্গে মিল ছিল বলেই মেঘনাদ বধ কাব্য আজও বাঙ্গালি হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, খ্যাতনামা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উনবিংশ শতকের ইতিহাসবিদ আইসিএস রমেশচন্দ্র দত্ত এবং আরও অনেকে কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করেছেন শ্রীরামকে নিয়ে অথবা রামায়ণকে নিয়ে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বললেন— ভারতবর্ষকে জানতে গেলে রামায়ণ পড়তে হবে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শরদিন্দু মুখার্জি বলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের কাছেই রামায়ণ শুধুমাত্র একটি পৌরাণিক কাহিনি নয়, এটি হলো প্রাচীন ভারতের প্রকৃত জীবনের ঘটনা। আমরা গৌড়ীয় রামায়ণের উল্লেখ পাই চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে। রাঢ় বাঙ্গলায় শঙ্কর কবিচন্দ্রের লেখা বিষ্ণুপুরী রামায়ণ একসময়ে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এরকম অসংখ্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্গলায় সাহিত্য কর্মের দেখা মেলে। কবি ও লেখক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— বাঙ্গলাকে বাদ দিয়ে ভারতের উত্তর অংশে অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লাওস, মালয়েশিয়া, কাম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে রামায়ণের প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে। 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে'— এস ওয়াজেদ আলির লেখা ভারতবর্ষ থেকেই আমরা দেখি পিতা থেকে পুত্র এ যেন এক ধারবাহিক সংস্কৃতি— রামায়ণ পাঠ করা বা করে উত্তরপুরুষকে শোনানোর। আজও গ্রামের অনেকেই কার্তিক মাসে, সারা মাস জুড়ে বাড়িতে সন্ধ্যেবেলায় রামায়ণ পাঠ করেন। এই বিষয়গুলো কি রামের সঙ্গে বাঙ্গলার সম্পর্ককে বোঝায় না? এই বহমান সংস্কৃতি একদিনে আসেনি, দীর্ঘদিনের শ্রদ্ধা ভক্তি দ্বারা লালিত জীবনচর্চা। তাছাড়া এই বঙ্গভূমিতে ৩৫টি প্রাচীন রামমন্দির রয়েছে— এও কি জীবন্ত প্রমাণ নয়?

পূজার্চনা এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে :

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আমরা সকলেই দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করি। বলা হয় যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ— দুইয়ে মিলে রামকৃষ্ণ। আমরা এও জানি যে রামকৃষ্ণের বাড়ির কুলদেবতা ছিলেন রঘুবীর বা শ্রীরাম। চণ্ডীদাসের কুলদেবতা ছিলেন শ্রীরাম। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনচরিত যিনি লিখেছিলেন সেই জয়ানন্দের

পরিবার রামের পূজা করতেন তাদের কুলদেবতা হিসেবে। জটাধারী নামে এক সাধু এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে এবং কিছুদিন গঙ্গাতীরে অবস্থান করেছিলেন। সে সময়ে সর্বধর্ম সমন্বয়ের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রাম সাধনার ভাবে ছিলেন। তিনি রামলালাকে জীবন্ত রূপে দেখতে পেয়েছিলেন। ঠাকুর তাকে নিয়ে গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন। ঠাকুর তাকে ভাত খেতে দিয়েছিলেন তাতে কয়েকটা ধানের খোসা থেকে গিয়েছিল। তাতে রামলালার ঠোঁট কেটে গিয়েছিল। যা দেখে ঠাকুর বলেছিলেন—'কৌশল্যা মা তোমাকে কত যত্ন করে মাখন ক্ষীর দিয়ে খাওয়ান আর আমি কীভাবে তোমাকে খাওয়াচ্ছি। যখন সেই জটাধারী সাধু চলে যান তখন সেই রামলালার বিগ্রহটি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়ে যান। সেটি দীর্ঘদিন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের গর্ভগৃহে ছিল। পরে সেটি একবার চুরি হয়ে যায়। ঠাকুর বলেন— 'হয়তো রামলালার প্রতি ভক্তি ও আন্তরিকতা কমে যাবার কারণেই তিনি চলে গেলেন আমাকে ছেড়ে।

রামরাজাতলায় রাম-লক্ষ্মণ-সীতার শোভাযাত্রা।

পূর্ব বর্ধমানে গোহগ্রাম নামে এক গ্রাম আছে। সেখানে রামনবমীতে সারা গ্রাম মেতে ওঠে। রামসেবায়েত ভট্টাচার্য পরিবার রামসীতার এক অষ্টধাতুর মূর্তি বসিয়েছিলেন। তা পূজা হয় শেষে হয় আবিরখেলা। সারা গ্রাম মেতে ওঠে এই উৎসবে। ১০৮টি কলস ভরে জল এনে রামসীতাকে স্নান করানো হয়। প্রাচীনকাল থেকে এই ঐতিহ্যশালী পূজা চলে আসছে।

১১১২ খ্রিস্টাব্দে শোভানাথ চন্দ্র নামে একজন একটি রঘুনাথ জিউর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন শ্রীবাটিতে। এই পরিবারটি একটি গুজরাটি পরিবার যারা ব্যবসাসূত্রে এখানে এসেছিলেন। সেই মন্দিরে আজও পূজা হয়ে চলেছে। রামানন্দ তেওয়ারী এবং মাধবরাও নামে আরও দুজন দক্ষিণ ভারত থেকে এসে বঙ্গদেশে বসতি গড়েছিলেন। তারাও রামের পূজা করতেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় যিনি বামাক্ষ্যাপা নামেই সমধিক পরিচিত তিনিও রামনবমীতে রামের পূজা করতেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে রামের এক গভীর সম্পর্ক ছিল। বাড়িতে রামলালার পূজা ছাড়াও তাদের নামকরণেও বংশপরম্পরায় একটা রীতি ছিল যেখানে রামের যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন রামকৃষ্ণ, তাঁর দাদার নাম ছিল রামেশ্বর ও রামকুমার, বাবার নাম ছিল ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। দাদুর নাম ছিল মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়— সবই রাম যোগে। এছড়া আমরা যেসব পরিচিত নামগুলি পাই যেমন— রামমোহন, রামপ্রসাদ, রামকিঙ্কর, রামশঙ্কর প্রভৃতি নামগুলি রামযুক্ত। দীর্ঘদিন ধরে নামের সঙ্গে রাম যুক্ত করা বাঙ্গলার মানুষের একটা পরম্পরা।

চন্দ্রকোণা শহরের উপকণ্ঠে অযোধ্যা বলে একটি গ্রাম বা মহল্লা আছে যেখানে রামসীতার মূর্তি সংবলিত মন্দির রয়েছে, এখন ভগ্নপ্রায়। পুরুলিয়ার একটা পাহাড়ের নাম অযোধ্যা পাহাড়। গোপীবল্লভপুরের একটি অরণ্যের নাম তপোবন। কথিত যে এখানে লব কুশের জন্ম হয়। এসব কাহিনি হতে পারে। মানুষের ভাবকে অস্বীকার করা যাবে কি? গ্রামে গ্রামে আজও যেসব পটচিত্রকররা যায় তারা রামায়ণ কাহিনিকে তাদের চিত্রে ফুটিয়ে তোলে। এই পটচিত্রীরা প্রাচীনকালের এক জনগোষ্ঠী। পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য— এটিও প্রাচীন এক লোকসংস্কৃতি, অনেক ক্ষেত্রে যার উপজীব্য কাহিনি হলো রামায়ণ।

বাঙ্গলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, বাঙ্গালির জীবনচর্চা সবখানেই শ্রীরামের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের জাতিসত্তা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অবমাননা শুধু নিন্দনীয় নয়, ভয়ংকর এক উন্মাদনা বলা চলে। আমাদের এই ক্ষতিকারক উন্মাদনা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

কেউ যদি শরণাগত হয়ে একবার বলে আমি তোমার, তবে আমি তাকে অভয় দান করি।

সকৃদেবপ্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে, অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম।। (বাল্মীকি রামায়ণ ৬.১৮.৩২) ◻

নবীন লেখকের হাত ধরে ভারতদর্শন

ড. তিলক রঞ্জন বেরা

নবীন লেখক দিগন্ত চক্রবর্তীর ‘যেমন ছিল আমার দেশ ভারতবর্ষ’পুস্তকটি যথেষ্ট সময়োপযোগী। বড়ো কথা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যার্থী হয়ে বই লেখার আগ্রহ— এটা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। পুস্তকের উপাদান পুরনো এবং প্রায় সকলের জানা, সেকথা লেখক নিজেও স্বীকার করেছেন। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তার তালিকাও দিয়েছেন। গীতা, রামায়ণ, মহাভারত থেকে শুরু করে কয়েকটি বই ও পত্রপত্রিকারও উল্লেখ করেছেন। ইন্টারনেটেরও সাহায্য নিয়েছেন। বাগানে ফুল তো অনেক ফুটে আছে, কিন্তু তা চয়ন করে বিভিন্ন দেব-দেবীর জন্য উপযুক্ত মালা গাঁথার মধ্যে ভক্তিভাব থাকে। বর্তমান সময়ের নবীন প্রজন্মের পাঠকদের জন্য লেখক পুস্তকটি নৈবেদ্যর ডালি রূপে উপস্থাপন করেছেন।

বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে চয়ন করা বিষয়বস্তু পাঠকদের অতীত ভারতকে জানার একটি মাধ্যম। বইটির কলেবর ছোটো। প্রচ্ছদ অতি সুন্দর। পুস্তকটি পাঠক সহজেই ব্যাগের মধে রেখেও সময়ে সময়ে পড়তে পারবেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী অদ্বৈতচরণ দত্ত মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা পাঠকদের নিশ্চিতভাবে উৎসাহিত করবে। জাপান-সহ বিশ্বের বহু দেশের ছেলে-মেয়েদের জন্মসূত্রে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়। দীর্ঘ পরাধীনতার কারণে ভারতবর্ষে দেশাত্মবোধের জাগরণ ঘটাতে হয় এবং নিয়মিত চর্চা করতে হয়। এমনকী সংগঠনের মাধ্যমে দেশ গঠনে উৎসাহিত করতে হয়। আশ্চর্যের কথা, দেশপ্রেমের বিরোধিতাও করা হয় এদেশে। সেদিক থেকে বিচার করলে উদীয়মান ছেলে-মেয়েদের পক্ষে এই বইটি খুবই সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয়। ভাষা প্রাঞ্জল, দীর্ঘ সময় পড়লেও একঘেয়েমি আসবে না।

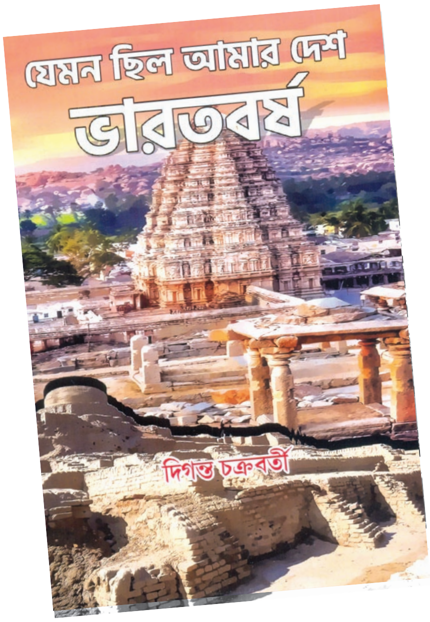

প্রাচীন ভারতকে জানার জন্য লেখক পুস্তকের বিষয়বস্তুকে এগারোটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রত্যেকটি অধ্যায় অল্পপরিসর হলেও বোধগম্য। বিশেষত ‘প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য’ অধ্যায়ের তথ্যগুলি খুবই আকর্ষণীয় যা বর্তমান নবীন পাঠকদের প্রায় অজানা। কারণ স্কুলপাঠ্যে এসব বিষয় জানা যায় না।

‘প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান’ অধ্যায়ে ঋষি কণাদের ক্ষেত্রে যে সাল ব্যবহার করা হয়েছে (২৬০০ এবং ২০০০) তা কিছুটা বিভ্রান্তিমূলক। বানান ভুল একটু বেশি আছে, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন হলে ভালো হবে। বইটিতে প্রাচীন ভারতের মুনি ঋষিদের দুষ্প্রাপ্য ছবি দেওয়া আছে যা আজকাল স্কুলের পাঠ্যবইয়ে থাকে না। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে শুধুমাত্র তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে তাই নয়, ভারত সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ,স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ মনীষীর স্বদেশ ভাবনা খুবই সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার করে সমস্ত বিষয়টিতে মনোগ্রাহী করা হয়েছে।

আজকাল নবীন পাঠকেরা সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহারে খুব একটা স্বচ্ছন্দ নন প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মাতৃভূমি সম্বন্ধে শ্লোক বা শ্রীঅরবিন্দের চৈতন্যযুক্ত মাতৃভাবনা খুবই প্রাসঙ্গিক। কবিগুরুর স্বদেশী সমাজ ভাবনা বেশ কিছু অংশ তুলে ধরা হয়েছে এবং নেতাজীর মা-কে লিখিত চিঠি নিত্যনতুন আবার চিরপুরাতন। এগুলি সর্বদা মনের মণিকোঠায় অনুরণিত হলে নবীন পাঠকদের মনে দেশপ্রেমের আগুন সদা প্রজ্বলিত থাকবে। পুস্তকটি মূলত সংকলন গ্রন্থ হলেও নবীন প্রজন্মের পাঠকদের দেশ সম্পর্কে জানার আগ্রহ অনেকটাই পূরণ করতে পারবে

পুস্তক : যেমন ছিল আমার দেশ ভারতবর্ষ। লেখক : শ্রী দিগন্ত চক্রবর্তী। প্রকাশক : তুহিনা প্রকাশনী । মূল্য : দুইশত টাকা।

হ্যাটসান অ্যাগ্রো আজ একটি বড়ো বিজনেস হাব

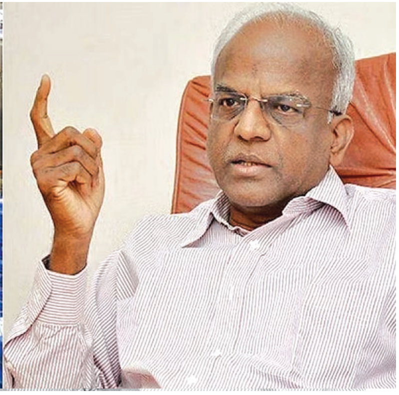

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রথাগত কোনো বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রিহীন, এক প্রান্তিক কৃষক পরিবারের সন্তান ভারতের একজন অন্যতম সফল ব্যবসায়ী রূপে আজ প্রতিষ্ঠিত। তিনি হলেন আর.জি.চন্দ্রমোগন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির নাম হ্যাটসান অ্যাগ্রো প্রোডাক্ট লিমিটেড। দুধ ও আইসক্রিমের ব্যবসাকে সফলভাবে দাঁড় করানোর একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ কেস স্টাডি হলো হ্যাটসান অ্যাগ্রো। সাম্প্রতিক কালে, দেশে বহু আইসক্রিম কোম্পানির উদয় হয়েছে। আবার তাদের অস্তাচলেও যেতে দেখা গিয়েছে। কোয়ালিটি আইসক্রিমের মতো কোম্পানিও হিন্দুস্থান ইউনিলিভার অধিগ্রহণ করেছে। মাত্র ১২ হাজার টাকা আর্থিক পুঁজি সম্বল করে শুরু হয়ে হ্যাটসান অ্যাগ্রো আজ ৫,৬০০ কোটি টাকার বার্ষিক টার্নওভার সম্পন্ন একটি কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। ৩০ হাজার কোটি টাকার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন সম্পন্ন এই কোম্পানি আজ ভারতের সর্ববৃহৎ দেশীয় ডেয়ারি কোম্পানি যা কোম্পানির মালিক তামিলনাড়ুর আর.জি. চন্দ্রমোগনের ব্যবসায়িক দক্ষতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিভার ফলশ্রুতি। তাঁর জীবনের প্রতিটি পর্ব থেকে অনেক কিছুই শিক্ষণীয়।

১৯৪৯ সালের ১ মার্চ তামিলনাড়ুর শিবকাশীর থিরুথঙ্গল গ্রামে এক সাধারণ কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। ১৩ হাজার টাকা পুঁজি ও ৩ জন কর্মচারী নিয়ে ১৯৭০ সালে আইস ক্যান্ডি প্রস্তুতকারক রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ। ব্যবসায় উন্নতির স্বপ্ন দেখতেন, কিন্তু পথপ্রদর্শক রূপে কাউকে তিনি পাননি। একদিন একটি বিয়ের রিসেপশনে গিয়ে জানতে পারেন যে সেখানে চেন্নাই থেকে আইসক্রিম আনানো হয়েছে। কিন্তু এত দূর থেকে আইসক্রিম আনার কী কারণ? স্থানীয় ভাবে কোনো আইসক্রিম শিল্প সেখানে তখনও গড়ে ওঠেনি। এই অভিজ্ঞতা থেকে বুদ্ধি অর্জন করে তিনি সবরকম প্রয়াস চালিয়ে সম্পূর্ণভাবে দুধ-নির্ভর আইসক্রিম প্রস্তুতকারক রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্কল্প করলেন। নানা কারণে মাঝপথেই তাঁর পড়াশোনায় ছেদ পড়ে। এরপর কিছুদিন একটি করাত কলে চাকরি করেন।

একজন আত্মীয়ের পরামর্শে নতুনভাবে শুরু করা ব্যবসার জন্য তামিলনাড়ু মার্কেন্টাইল ব্যাংক থেকে ১২ হাজার টাকা ঋণ এবং তাঁর বাবার ৩ টি দোকান বিক্রি করে প্রাপ্ত ১৩ হাজার টাকা— অর্থাৎ সব মিলিয়ে এই ২৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে ১৯৭০ সালে একটি জায়গা ভাড়া নিয়ে একটি আইসক্রিম কারখানা শুরু করলেন। এই আইসক্রিম কারখানার মাধ্যমে 'অরুণ আইসক্রিম' নামক ব্র্যান্ডটির আবির্ভাব ঘটলো। ১৮ বছর পর ১৯৮৭-৮৮ সালে চন্দ্রমোগনজীর কোম্পানির বার্ষিক টার্নওভার দাঁড়ায় ১ কোটি টাকা। এর ১৩ বছর পর কোম্পানির বার্ষিক টার্নওভার পৌঁছয় ১০০ কোটি টাকায়। এর ৮ বছর পর এই কোম্পানি বার্ষিক ১ হাজার কোটি টাকা টার্নওভারের লক্ষ্য অর্জন করে। এইভাবে প্রতি বছর নতুন নতুন মাইল ফলক স্পর্শ করতে করতে এই কোম্পানি আজ বার্ষিক ৫ হাজার কোটি টাকা টার্নওভার সম্পন্ন একটি বড়ো মাপের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। হ্যাটসান অ্যাগ্রো প্রোডাক্ট লিমিটেডের সঙ্গে বর্তমানে ৭ লক্ষেরও বেশি কৃষক যুক্ত রয়েছেন। ৩৪ লক্ষ লিটার দুধ প্রতিদিন সংগৃহীত হয়। এই কোম্পানি ১০ হাজারের বেশি মিল্ক ব্যাংক স্থাপন করেছে। ৪৮০০টি দুগ্ধ পরিবহণকারী যান, ২০টি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট, ৩৫০০টি খুচরো বিপণন কেন্দ্র, ২ লক্ষেরও বেশি খুচরো বিক্রেতা, ৫২ হাজারের বেশি ফ্রিজার, ২০ হাজারের বেশি কুলার সম্পন্ন এই প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ - অপ্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৫০ হাজার ব্যক্তির প্রত্যহ আয়ের সংস্থান করে চলেছে। এই আইসক্রিম ব্র্যান্ড আজ বিশ্বের ৪২টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

শুরুর দিনগুলোতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবে আইসক্রিমের ব্যবসা ছিল একটি রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয়। উৎপাদিত আইসক্রিম সংরক্ষণের জন্য ফ্রিজার এবং ফ্রিজারের জন্য বিদ্যুৎ ছিল প্রয়োজনীয়। সেই সবের অভাবে এই ব্যবসার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি ছিল না।

এইজন্য বড়ো কোম্পানিগুলি মেট্রো শহরকেন্দ্রিক ব্যবসা স্থাপন ও ব্যবসা প্রসারে অধিক গুরুত্ব আরোপ করতো। সেই সময়ে চেন্নাই থেকে দূরে একটি ছোটো-খাটো আইসক্রিমের ব্যবসা শুরু করে আর.জি.চন্দ্রমোগনের এই প্রতিষ্ঠান অন্য কোম্পানিগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েও ব্যবসার বিকাশের নিত্য নতুন সুযোগ সন্ধানে প্রতিনিয়ত ব্যবসায়িক উন্নতি করতে থাকে। উৎপাদিত পণ্যের গুণমানের উন্নতির স্বার্থে তাঁর কোম্পানি আইসক্রিম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল দুধ উৎপাদনকারী কৃষকদের থেকে সরাসরি সংগ্রহ করতে শুরু করে এবং পরবর্তীকালে আইসক্রিম প্রস্তুতকারক কোম্পানি থেকে ধীরে ধীরে একটি পুরোদস্তুর ডেয়ারি কোম্পানিতে পরিণত হয়। আর.জি. চন্দ্রমোগনের এই বড়ো মাপের সম্পূর্ণ দেশীয় ডেয়ারি প্রতিষ্ঠান আগামী প্রজন্মের কাছে অন্যরকম চিন্তা ভাবনা, আত্মনির্ভরতা ও সাফল্য অর্জনের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ◘

ধাত্রী পান্নার ত্যাগ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেশ, ধর্ম, কর্তব্য ও স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন বলিদান করা মহান মানুষের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু প্রভুপুত্রের জীবন রক্ষার জন্য নিজের প্রাণপ্রিয় পুত্রকে ঘাতকের হাতে তুলে দিয়ে যে উদাহরণ ধাত্রী পান্না সৃষ্টি করেছেন তা বিশ্ব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। ইতিহাসে প্রভুভক্তির এরকম উদাহরণ খুবই কম দেখা যায়। কোথায় এমন মা আছেন যিনি প্রভুপুত্রকে রক্ষার জন্য নিজের কোলের সন্তানকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিতে পারেন? ধন্য সেই প্রভুভক্তি! যিনি চোখের সামনে নিজের পুত্রকে বলি হতে দেখে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হননি।

মেবারের গৌরবসূর্য ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছিল। তার ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিল। রাজপুত যোদ্ধারা সম্মুখ সমরে বীরগতি লাভ করেছে। তাদের কুলবধূরাও জহরব্রত করে জীবন বলিদান দিয়েছেন। রাণা সংগ্রাম সিংহও বীরগতি লাভ করেছেন। মেবারের রাজসিংহাসনে বসে তখন দাসীপুত্র বনবীর রাজত্ব করছেন। এরকম সময়ে রাজবংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী সংগ্রাম সিংহের শিশুপুত্র উদয় সিংহ ধাত্রী পান্নার কোলে পুত্রস্নেহে পালিত হচ্ছেন। সেই শিশু কি জানে যে তাকে বধ করার জন্য বনবীর ষড়যন্ত্র রচনা করছে?

মেবারের সিংহাসনে বসে দাসীপুত্র বনবীর রাতদিন চিন্তা করছে, যতদিন মেবার রাজসিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী উদয় সিংহকে হত্যা করা না যাচ্ছে, ততদিন তার অধিকার সুরক্ষিত নয়। তাই বনবীর প্রতি রাতে তার অভিলাষা পূরণ করার চেষ্টা করত। কিন্তু সুযোগ হয়ে উঠত না।

একদিন গভীর রাতে কেউ কোথাও জেগে নেই। এমনিতে পুরুষের সংখ্যা খুবই কম। সমস্ত রাজপ্রাসাদ নিঃঝুম। নিজের পুত্র ও রাজকুমারকে পাখার বাতাস করে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন ধাত্রী পান্না। হঠাৎ রাজমহলের ভেতর থেকে কোলাহল শুনলেন পান্না। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এক দাসী ছুটে এসে খবর দিল, নিষ্ঠুর বনবীর রাজকুমার বিক্রমকে হত্যা করে উদয় সিংহকে হত্যা করার জন্য এদিকেই আসছে। দাসীর মুখে সবকিছু শুনে পান্না ভাবতে লাগলেন, আমার সামনেই কি এই রাজবংশ শেষ হয়ে যাবে আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব? না, কখনোই নয়। আমি কুমার উদয় সিংহকে যেভাবেই হোক রক্ষা করব। কুমার রক্ষা পেলেই দেশ ও ধর্মের রক্ষা হবে। রানিমা জহরব্রত করার আগে আমাকে কুমারকে রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। এ দায়িত্ব আমাকে পালন করতেই হবে।

ঘরের এক কোণে ফলের একটি ঝুড়ি রাখা ছিল। পান্না কুমারকে পালঙ্ক থেকে উঠিয়ে সেই ঝুড়ির মধ্যে রেখে একজন দাসকে দিয়ে সন্তর্পণে মহলের বাইরে নিয়ে যেতে বললেন আর নিজের পুত্রকে কুমারের পালঙ্কে শুইয়ে রেখে পাখার হাওয়া করতে লাগলেন।

খোলা তলোয়ার হাতে ঝড়ের বেগে বনবীর পান্নার ঘরে প্রবেশ করে কর্কশকণ্ঠে জানতে চাইল, কুমার কোথায়? ধাত্রী পান্না একটিও কথা না বলে শুধুমাত্র আঙুলের ইশারায় পালঙ্কে শোয়ানো নিজ পুত্রের দিকে দেখিয়ে দিলেন। কালবিলম্ব না করে নিষ্ঠুর বনবীর তলোয়ারের এক কোপে ওই বালকের ধর থেকে মাথা আলাদা করে ফেলল।

ধাত্রী পান্না চোখের সামনে নিজের পুত্রকে হত্যা করতে দেখে বুক ফেটে গেলেও একটি শব্দ পর্যন্ত করলেন না। বনবীর তার ইচ্ছা পূরণ করে ফিরে গেল। পান্না রাজমহল থেকে বেরিয়ে কুমারের খোঁজ করতে লাগলেন। রাজমহলের কেউ জানতেও পারল না ধাত্রী পান্না নিজের পুত্রের জীবন বলিদান দিয়ে মেবার রাজবংশের একমাত্র প্রদীপকে জ্বালিয়ে রাখলেন।

চিতোড়ের পশ্চিম দিকে সেই দাস কুমারকে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। পান্না সেখানে পৌঁছে কুমারকে নিয়ে দেবল নগরে গিয়ে সিংহরাওজীকে অনুরোধ করলেন কুমারকে আশ্রয় দেবার জন্য, কিন্তু বনবীরের ভয়ে তিনি অস্বীকার করলেন। বীরাঙ্গনা পান্না হতাশ না হয়ে দুর্গম আরাবল্লী পর্বতের গ্রাম কমলমীরে পৌঁছলে আশা শাহ পান্নার বুদ্ধিমত্তা ও প্রভুভক্তির পরিচয় পেয়ে কুমারকে আশ্রয় দিলেন। সমস্ত রকম বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে ধাত্রী পান্না রাণাবংশের একমাত্র উত্তরাধিকারীকে রক্ষা করে নিজের নাম ইতিহাসে অমর করে রেখে গেছেন।

বভ্রুবাহন ঘোষ

বীর বনবাসী

খাজ্যা নায়েক

স্বাধীনতা সংগ্রামী খাজ্যা নায়েক মধ্যপ্রদেশের সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর বাড়ওয়ানি জেলার সাংঘা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভীল জনজাতি সমাজের মানুষ ছিলেন। তাঁর বাবা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে সিপাহি ছিলেন। বাবার চাকরি ছেলে পান। সামান্য একটি ভুলের জন্য খাজ্যা নায়েককে কর্তৃপক্ষ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয়। জেলজীবন ভোগ করতে করতে ইংরেজদের প্রতি তাঁর ঘৃণা সৃষ্টি হয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। তিনি স্থানীয় স্বাধীনতা সেনানী ভীমা নায়েকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভীল যুবকদের নিয়ে স্বাধীনতা সেনানী গঠন করেন। ইংরেজদের সঙ্গে ভীল সেনানীর ঘোর যুদ্ধ হয়। ইংরেজরা তাঁর সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। একসময় কর্নেল জেমস আউট্রাম ছলনা করে তাঁকে বন্দি করে এবং ১৮৫৮ সালের ১১ এপ্রিল হত্যা করে।

জানো কি?

- ভারতের প্রথম মহিলা মহাকাশচারী ছিলেন কল্পনা চাওলা।
- ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক বলা হয় দাদা সাহেব ফালকে-কে।
- পঞ্জাব পঞ্চনদের দেশ নামে পরিচিত।
- খড়্গপুর ভারতের প্রথম ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (IIT)।
- ইলেক্ট্রিক বাল্বের ফিলামেন্ট তৈরি হয় টাংস্টেন দিয়ে।
- সূর্যের মধ্যে বেশি পরিমাণে রয়েছে হাইড্রোজেন গ্যাস।
- দেশের স্টিলফ্রেম বলা হয় আমলাদের।

ভালো কথা

রক্তদান

আমার মা ও বাবা দুজনেই রক্তদান সমিতির সদস্য। আমি যখন নবম শ্রেণীতে পড়ি তখন একদিন মা বললেন তোমার বাবার একশোবার রক্ত দেওয়া হয়ে গিয়েছে আর আমার ৩২ বার। আমি একবার রক্ত দেওয়া জন্য বায়না ধরলে মা বলেছিলেন, এখন নয়, আগে আঠারো বছর বয়স হোক। আমি এবার দ্বাদশ শ্রেণীতে উঠেছি আর বয়সও আঠারো হয়ে গিয়েছে। কদিন আগের রক্তদান শিবিরে এবার আমি প্রথম রক্ত দিলাম। আমার খুব আনন্দ হলো এই ভেবে যে আমিও একজন রক্তদাতা।

যাজ্ঞসেনী কর, দ্বাদশ শ্রেণী, আগরতলা, ত্রিপুরা ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ল ধা য য়
(২) ন তা য় রা

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) গু ম আ ল ডু ক্কে
(২) লা ত শ পা গা আ

২৬ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) করিতকর্মা (২) করুণাময়ী

২৬ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) আবাল্যসহচর (২) অবাকজলপান

উত্তরদাতার নাম

(১) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯। (২) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, ইংলিশ বাজার, মালদা। (৩) শুভম হালদার, ক্যানিং, দ: ২৪ পরগণা (৪) শিবানী রায়, কর্ণজোড়া, রায়গঞ্জ, উ: দিনাজপুর

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

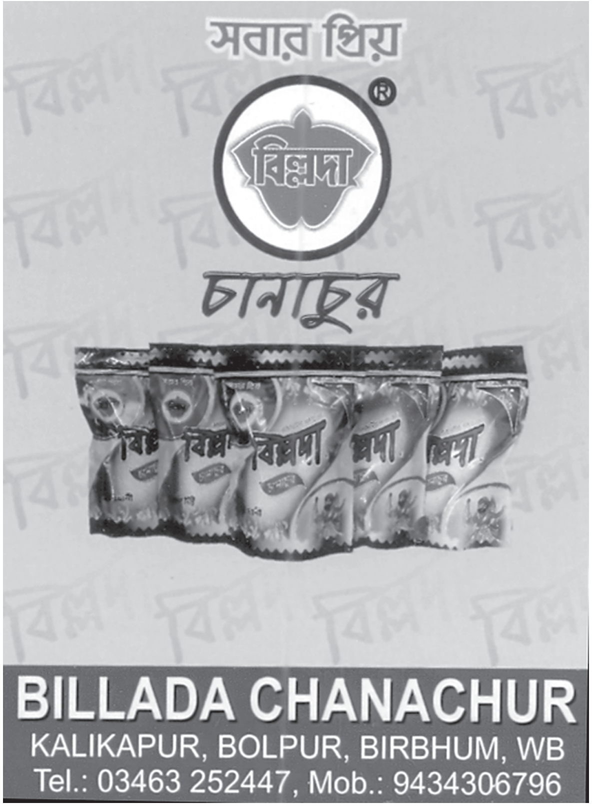

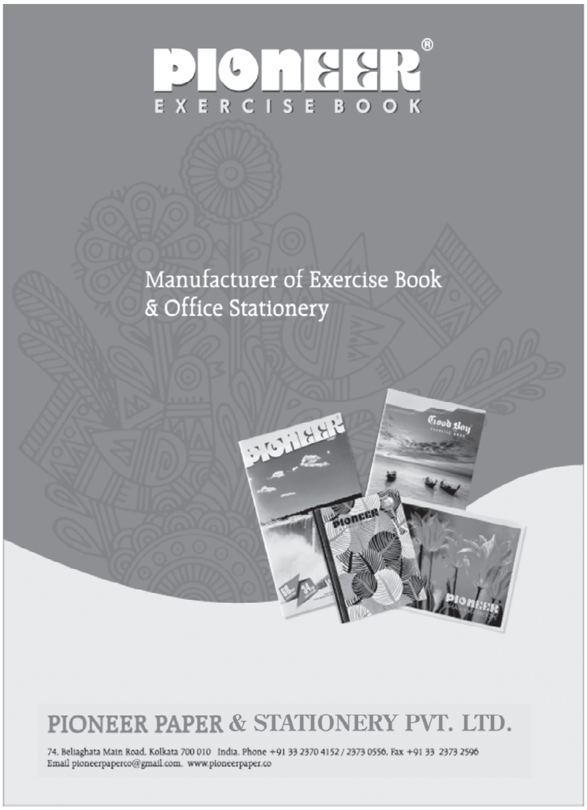

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

কেন খুনের মামলা দায়ের করা হবে না? সংবিধানের বিধি নিয়ম অনুসারে স্থানীয় নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক করা এবং নির্বাচনের সময় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। সেজন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে খুনের মামলার ট্রায়াল শুরু হবে না কেন? এই রাজ্যে রক্তাক্ত নির্বাচনী হিংসার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সেজন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন এই রাজ্য এক ধাপে এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া নির্বাচন করানোর কথা ভারতেই পারে না। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় বাহিনি ছাড়া এক ধাপে নির্বাচন করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ এবং বিরোধী দলগুলির প্রতিবাদ সত্ত্বেও রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকার নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকেছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশের পরেও রাজ্য নির্বাচন কমিশনার ও রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ না করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত যায়। সুপ্রিম কোর্টে মামলা হেরে গিয়ে অবশেষে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগে রাজি হলেও শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেনি। স্বাভাবিকভাবেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের যাবতীয় অনিয়ম, গণতন্ত্র হত্যা ও মানুষ হত্যা। তাই নির্বাচিত রাজ্য সরকার কোনোভাবেই এড়াতে পারে না।

বামঘেঁষা মিডিয়াগুলো এটা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে যে বাম আমলের চাইতে নির্বাচনী হিংসা নাকি এখন অনেকটাই বেড়ে গেছে। যদিও কিছু হাস্যকর যুক্তি ছাড়া এই বক্তব্যের কোনো সারবত্তা নেই। আসলে বামেরা দুষ্কৃতীদের ব্যবহার করে হাড়হিম করা সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে নির্বাচনে জয় লাভ করত। কিন্তু তৃণমূল জমানায়

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাসের জেরে ঘরছাড়া, রাজ্যছাড়া, দেশছাড়া

সাধন কুমার পাল

এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করার কোনো মানে হয় না। মনোনয়ন থেকে গণনা সবটাই কারচুপি। এইটুকু বলা যায় যেসব স্থানে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বিরোধী দল সাংগঠনিক শক্তির জোরে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এবং মানুষ নিজের ভোট দিতে পেরেছে সেখানেই তৃণমূল গোহারা হেরেছে।

এবারে নির্বাচনে মৃতের সংখ্যা ৫০ পেরিয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের হিংসায় মৃত এবং তৃণমূলের তকমা আছে এরকম মাত্র ১৯ জনকে দু' লক্ষ করে টাকা ক্ষতিপূরণ ও হোমগার্ডের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কোন যুক্তিতে শুধুমাত্র উনিশ জনের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাবেন? হিংসায় মৃতদের ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রেও কি উনি নিজের দলের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন না? পশ্চিমবঙ্গে একটা প্রাণের দাম কি মাত্র দু' লক্ষ টাকা? না, এই সমস্ত প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।

কিন্তু যে প্রশ্ন কেউ করছে না তা হলো এতগুলো মানুষের মৃত্যুর জন্য দুষ্কৃতীরাই রাজনীতির নিয়ন্ত্রক। এদের রাখঢাক, লাজ লজ্জা, সামাজিক দায়বদ্ধতার কোনো বালাই নেই। সেই জন্য এখন ভোটারদের ধমকানো, চমকানো, বুথদখল, ছাপ্পা ভোট দেওয়ার মতো অপরাধ সর্বসমক্ষে প্রকাশ্য দিবালোকে সংগঠিত হচ্ছে। বাম জমানায় পর্দার আড়াল থেকে নেতারা দুষ্কৃতীদের মদত দিতেন, আর এখন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা দুষ্কৃতীদের সঙ্গে হাতে হাতে মিলিয়ে অপরাধ সংগঠিত করছেন।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে বাম দল ও তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এলেও সুস্থ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিফলিত জনমতের উপর এদের কোনোরকম আস্থা নেই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সামান্যতম বিশ্বাস থাকলে এত বড়ো নির্বাচনী সন্ত্রাস কখনোই সংগঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন মানেই মনোনয়ন থেকে গণনা সবেতেই কারচুপি। নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করার প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে সংঘটিত হয়। এই বিজ্ঞানসম্মত অপরাধ

ফ : ৬

প্রক্রিয়ার প্রণেতা বামেরা।

প্রথম ধাপটি সংগঠিত হয় নির্বাচন ঘোষণার অনেক আগে থেকেই। সংগঠনের মাধ্যমে কানে কানে রটিয়ে দেওয়া হয় আসন্ন নির্বাচনে বিরোধীরা লড়তে গেলে তার পরিণতি হবে মারাত্মক। তৃণমূল কংগ্রেসকে যারা ভোট দেবে না তাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে, সবুজ সাথীর সাইকেল কেড়ে নেওয়া হবে, ১০০ দিনের কাজ থেকে শুরু করে সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হবে ইত্যাদি। এই ভয়ের পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে মনোনয়নে অংশগ্রহণ করতে গেলে শুরু হয় সন্ত্রাস প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ। এই ধাপে বিডিয়ো অফিস বা এসডিও অফিসে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় আটকে দেওয়া, জোর করে হাত থেকে কাগজপত্র ছিনিয়ে নেওয়া, মারধর করার মতো সমস্ত অবরাধ পরিকল্পিতভাবে সংঘঠিত করা হয়।

সন্ত্রাস প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপে সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে যারা মনোনয়ন পত্র জমা করেছে তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে তাদের বাড়িতে সাদা থান, ফুলের মালা পাঠিয়ে দিয়ে পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। এত কিছুর পরেও যখন বিরোধীরা নির্বাচনী ময়দানে টিকে থাকে তারপর শুরু হয় এই সন্ত্রাস প্রক্রিয়ার চতুর্থ ধাপ। এই ধাপে বিরোধীদের প্রচার করতে না দেওয়া, মিছিল মিটিং করতে না দেওয়া, মারধর করা— এই সমস্ত অপরাধ সংগঠিত হয়।

সন্ত্রাস প্রক্রিয়ার পঞ্চম ধাপটি সংগঠিত হয় নির্বাচনের আগের দিন। পাড়ায় পাড়ায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো, বাইক বাহিনী দিয়ে মানুষকে সন্ত্রস্ত করা, নির্বাচন কর্মীদের ভয় দেখানো, বিরোধী দলের পরিচয়পত্র ছিনিয়ে নেওয়া, তাদের কিডন্যাপ করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া এই সমস্ত কাজগুলি সংঘটিত হয়। ব্যাপট পেপারে ভোট হলে রাতেই ছাপ দিয়ে ব্যালট বক্সে ঢুকিয়ে দেওয়ার মতো অপরাধ সংগঠিত হয়। সন্ত্রাস প্রক্রিয়ার ষষ্ঠ ধাপটি সংঘটিত হয় নির্বাচনের দিন। এইদিন বুথ জ্যাম করা, ভোটারদের বাড়িতেই আটকে দেওয়া, ভোটিং কম্পার্টমেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, সুযোগ বুঝে বুথ দখল করে নিয়ে দেদার ছাপ্পা চালানো, বিরোধী দলের এজেন্টকে বুথ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে, ভোটকর্মীদের ভয় দেখিয়ে নীরবে ছাপ্পা চালানো, 'শান্তিপূর্ণ' ভোট শেষ হয়ে গেলে আসল ব্যালট বক্স সরিয়ে নকল ব্যালট ভরা ব্যালট বক্স প্রতিস্থাপিত করার মতো ভয়ংকর অপরাধ সংঘঠিত হয়।

আগের ছয়টি ধাপ সফল না হলে সপ্তম ধাপে স্ট্রংরুমে ব্যালটবক্স পালটে দেওয়ার মতো অপরাধ সংঘঠিত হয়।

ভোট সন্ত্রাসের অষ্টম ধাপে টার্গেট বিরোধী দলের কাউন্টিং এজেন্ট। বিরোধীদের কাউন্টিঙের আগের দিন রাতে অথবা গণনাকেন্দ্রে পৌঁছানোর পথেই পরিচয়পত্র কেড়ে নেওয়া হয় যাতে তারা গণনাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে না পারে। গণনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীরাও অনেক সময় ক্ষমতাসীন দলের হয়ে বিভিন্ন রকম পদ্ধতিতে বিরোধীপক্ষের বৈধ ভোটকে কালির ফোঁটা বা টিপছাপ লাগিয়ে দিয়ে অবৈধ করে দিয়ে ফলাফল এদিক সেদিক করে দেয়। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের জয়ী প্রার্থীকে গণনা কেন্দ্রের মধ্যে ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে তৃণমূলে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে। শোনা যায়, রিটার্নিং অফিসারের কপালে বন্দুক ঠেকিয়েও নাকি পঞ্চায়েতের ফলাফলে হেরফের করা হয়েছে ।

উপরে বর্ণিত আটটি প্রক্রিয়ার একটিও কাজ না করলে নবম ধাপে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের আগে বিরোধী দলের পঞ্চায়েত সদস্যদের কিডন্যাপ করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয় এবং গরিষ্ঠতা না পেলেও গায়ের জোরে ক্ষমতাসীন দল তৃণমূলে যোগদান করিয়ে ঘুরিয়ে বোর্ড দখল এবং বিরোধী দলের সমর্থকদের এলাকা ছাড়া করা হয়।

একুশের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের ফলে কোচবিহার-অসম সীমানা এলাকার বহু বাসিন্দা প্রাণ বাঁচাতে অসমে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সে সময় রাজ্যপাল জগদীশ ধনকর অসমে ক্যাম্প করে থাকা মানুষদের সান্ত্বনা দিতে অসম ছুটে গিয়েছিলেন। এবারের অর্থাৎ ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ছবিটা আরও ভয়াবহ। এবার ভোট পরবর্তী হিংসা থেকে বাঁচতে তুফানগঞ্জ-১ নম্বর ব্লকের চরবালাভূত এলাকার বাসিন্দারা বাংলাদেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। ৮ জুলাই ভোট মিটতেই তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে সন্ত্রাস শুরু হয়ে যায়। তুফানগঞ্জ-১ নম্বর ব্লকের বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৪০টি বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তৃণমূল হার্মাদদের তাড়া খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে বিজেপি-সহ বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকরা অসমে গিয়ে আশ্রয় নেন। অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেও এই ঘটনার কথা জানা যায়।

অন্যদিকে, বলরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দীছেচুরা গ্রামের এক তৃণমূল কর্মী সিপিএমের হামলায় জখম হয়ে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দেওচড়াইয়ের গৌরমোহন বাজারে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের চারটি দোকান ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের চর বালাভূত এলাকায় যেতে হলে কালজানি নদী পেরোতে হয়। ওইদিন রাতে ওই এলাকায় বিরোধী দলের সমর্থকদের বাড়ি বাড়ি হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সন্ধ্যার পর নদী পেরিয়ে বালাভূতে আসার কোনও ব্যবস্থা না থাকায় পরিবার নিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন অনেক পরিবার। স্থানীয় সূত্র অনুসারে শিশু ও মহিলা-সহ প্রায় ২৫০ জন মানুষ বাংলাদেশের উত্তর তিলাই এবং উত্তর তিলাই নামাপাড়া গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন মানেই যেন মৃত্যু, আতঙ্ক, ভিটে ছাড়া, রাজ্য ছাড়া, দেশছাড়া, স্বজনহারা, হাহাকার, আর্তনাদ। ▯

বাঙ্গালি হিন্দুর শেষ আশ্রয়স্থান পশ্চিমবঙ্গ

অবিনাশ ভট্টাচার্য

স্বাধীনতার পর থেকে বিগত ৭৫ বছরে গঙ্গায় বহু জল বয়ে গেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ যা মূলত বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য গঠিত হলেও আজ হিন্দুদের হাতছাড়া হবার উপক্রম। অবস্থা এমন যে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ তাদের হিতের প্রয়োজনীয় বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত প্রকাশ, প্রতিবাদে আগ্রাসী হওয়ার সাহসটুকুও হারিয়েছেন। আজ তারা শুধুই পাওয়ায় খুশি। নিজ স্বার্থে চক্ষুমুদিত অসহায় ও হতাশাগ্রস্ত এক বৃহত্তর সমাজ। কিন্তু ১৯৪৭ সালে বর্তমানে ভারতে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটির জন্ম হয়েছিল এক তীব্র মরণপণ সংগ্রাম ও রক্ত স্নানের মতো প্রতিবাদের, প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে। ১৯৪৬-এর কলকাতার দাঙ্গা তার পূর্ব ইঙ্গিতবাহী বলে ধরে নেওয়া যায়। এটি দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যদি এই ভূখণ্ড সৃষ্টি না হতো তাহলে পূর্বতন অখণ্ড বঙ্গের অন্তত একটি অংশেও বহুত্ববাদ বলে কিছু অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না যা একটি পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হওয়া যায়।

১৯৪৯-এর পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ২৯ শতাংশ হিন্দু। যা আজ ৮ শতাংশের দোরগোড়ায় এবং গবেষকদের মতে, উত্তরোত্তর ইসলামি বাংলাদেশের কল্যাণে সেই পরিসংখ্যান হিন্দু শূন্য হতে বেশিদিন সময় লাগবে না। আর এই পরিসংখ্যানে প্রমাণ করে মুক্তমনা বা liberal-দের অবস্থাও তথৈবচ। অর্থাৎ ১৯৪৭-এর তৎকালীন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হিন্দু রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ দেশভাগের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বঙ্গপ্রদেশ বিভাজনের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, তার সার্থকতা এই ভয়ংকর সময়ে যখন নিয়ন্ত্রণ আঘাতে সুস্থ, ধর্মীয় ও মানবিক চিন্তা রক্তাক্ত হয় তখনই বোঝা যায়।

আমাদের অনেকেরই ধারণা হয়তো নেই যে ভারতের প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যের একটি করে রাজ্য দিবস রয়েছে। ১ মে মহারাষ্ট্র দিবস, ১ নভেম্বর কর্ণাটক দিবস, ৩০ মার্চ রাজস্থান দিবস ইত্যাদি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দু নিধন যজ্ঞ ও রক্ত স্নানের মধ্য দিয়ে পাওয়া হিন্দু বাঙ্গালি জাতির শেষ আশ্রয়স্থান এই পশ্চিমবঙ্গের স্থাপনা দিবস পালনের উৎসাহ কেউ দেখায়নি। আগামী প্রজন্ম যদি প্রশ্ন করে, এই অনুৎসাহের কারণ বাঙ্গালি হিন্দুর চিন্তন মননকে অবদামিত করার জন্যই কিনা? বাস্তব ইতিহাস থেকে দূরে রাখার জন্য দায়ী মুক্তমনা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃবৃন্দ তার উত্তর দিতে প্রস্তুত থাকবেন কিনা তা জানা নেই। কিন্তু এখনও খুব দেরি হয়ে যায়নি, এখনও হিন্দু জাতির নিদ্রাভঙ্গ হওয়া প্রয়োজন, প্রয়োজন চেতনার উন্মেষ ঘটা। নাহলে পরিবর্তিত কাল চক্রের নয়া ইতিহাসের দাবি জাতির মুখে বিষণ্ণতার ছাপ দেখে ইতিহাস ভোলা জাতিকে ধিক্কার জানাবে।

এটি স্মরণে রাখা প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল দেশভাগের সময়, বিশেষত স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে, বিশিষ্ট হিন্দু প্রবুদ্ধ ও বিদ্বজ্জনের নেতৃত্বে ও রাজ্যবাসীর নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের বঙ্গীয় আইন সভায় সম্মিলিত ভোটদানের মাধ্যমে। তাই প্রত্যেক বাঙ্গালি তথা পশ্চিমবঙ্গবাসীর পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন এক ঐতিহাসিক ও আবশ্যিক কর্তব্যও বটে।

পশ্চিমবঙ্গের দাবি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একাকী কিন্তু ক্রমে যুক্তি ও বোধে শাণিত হয়ে তাঁর পাশে দৃঢ়চিত্তে এসে দাঁড়িয়েছিলেন প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, নলিনাক্ষ সান্যাল, পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, মেজর জেনারেল এসি চ্যাটার্জি, নলিনীরঞ্জন সরকার, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, বিধানচন্দ্র রায়, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মেঘনাদ সাহা, স্যার যদুনাথ সরকার, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. মাখনলাল রায়চৌধুরী, অমৃতবাজার-যুগান্তর পত্রিকা গোষ্ঠী, আনন্দবাজার পত্রিকা, দৈনিক বসুমতি, মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসী গোষ্ঠী, ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ড. বিনয় সরকার প্রমুখ ব্যক্তিরা।

এমতাবস্থায় ২০ জুন, ১৯৪৭ সালে বঙ্গপ্রদেশের হিন্দু প্রধান অঞ্চলের সদস্যরা পৃথকভাবে বসেন। কংগ্রেসের সঙ্গে হিন্দু মহাসভা ও অন্যান্য হিন্দু প্রতিনিধিরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে জোট দেয় এবং পক্ষে সর্বমোট ভোট পড়ে ৫৮টি। মুসলিম লিগ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধী হিসেবে দলবদ্ধভাবে ভোট দেয়; তাদের পক্ষে ভোট পড়ে ২১টি। ৫৮-২১ ভোটে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব, সমস্ত প্রতিকূলতার বিপক্ষে আসীন হয়ে, গৃহীত হয়। এটি বলা প্রয়োজন, মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদে এটি পূর্ব থেকেই সিদ্ধান্ত ছিল, একটি বিভাগের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিরা বাংলা ভাগে ইচ্ছুক হলেই, প্রস্তাব গৃহীত হবে। হিন্দু বিভাগে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস সেই পথেই যায়, সৃষ্টি হয় পশ্চিমবঙ্গের।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আইন অনুসারে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ও পঞ্জাব ভাগের ব্যবস্থা হলেও, বঙ্গীয় আইনসভা ভারত বা পাকিস্তানে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে একমত না থাকায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভা ভেঙে তৈরি হয় পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা নামক দুটি পৃথক আইন সভা। মুসলমান প্রধান অঞ্চল নিয়ে হয় পূর্ববঙ্গ ও হিন্দু প্রধান অঞ্চল নিয়ে হয় পশ্চিমবঙ্গ।

এই দিনেই পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার সদস্যরা ৫৮ থেকে ২১ ভোটে বাংলা ভাগের পক্ষে ও পাকিস্তানের যোগদানের বিপক্ষে ভোট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠন সুনিশ্চিত করেন। তারই ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালের ২০ জুন তৈরি হলো পশ্চিমবঙ্গ ও তার আইনসভা। আজ আমাদের এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে নিজেদের অবস্থান এবং এই পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার প্রতি সকলের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। □

আত্মহত্যা মহাপাপ

সজল কুমার গুহ

আত্মহত্যা বলতে বুঝি ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া বা স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণনাশের প্রক্রিয়া বিশেষ। আশ্চর্যের বিষয় যে আত্মহত্যার প্রবণতা যাদের তারা নাকি আদতে মরতে চান না বরং যন্ত্রণাকে কমাতে চান কিন্তু সমস্যা থেকে মুক্তি না পেয়ে শেষমেশ নিজের জীবনকে শেষ করে দেন।

আত্মহত্যা নতুন কিছু নয়। ৪৩৪ খ্রিস্টপূর্ব এমপেদোকলেস নামক এক ব্যক্তি বিশ্বাস করতেন মৃত্যু একটি রূপান্তর। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেকে সিসিলীয় এটানা পর্বতস্থিত আগ্নেয়গিরি থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে শেষ করে দেন। আত্মহত্যা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা গবেষণা ইত্যাদি অতীতেও ছিল এবং এখনো চলছে নানা দেশে, নানা স্তরে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঘোষণা অনুযায়ী ১০ সেপ্টেম্বর দিনটি 'বিশ্ব আত্মহত্যা রোধ দিবস' (World Suicide Prevention Day) হিসেবে পালন করা হয়।

আত্মহত্যার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে কোনো অবস্থানে বন্দি, প্রচণ্ড মানসিক কষ্ট, মৃত্যু নিয়ে বেশি চিন্তা, ঘনঘন মেজাজ পরিবর্তন, অত্যধিক চিন্তা, অপরাধবোধ, লজ্জা, প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা। কখনো আবার ঘুমের রুটিন পরিবর্তন। মানুষের আত্মমর্যাদায় আঘাত হলে আত্মহত্যা হতে পারে। এছাড়া, মদ্যপানে আসক্তি, চারপাশের সব কিছুতেই নির্লিপ্ততা, অতিরিক্ত বিরূপ ধারণা, বেঁচে থাকাটা কতটা যন্ত্রণাদায়ক সেই ধারণা পোষণ ইত্যাদি।

পৃথিবীজুড়ে যত মৃত্যু হয় তার তেরোতম কারণ হচ্ছে আত্মহত্যা নামক এক ভয়াবহ পরিণতি। দেশে বিদেশে ধনী-গরিব, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী, বিখ্যাত বিখ্যাত নর-নারী, যুবক-যুবতী, বয়স্ক-বয়স্কা এমনকী অল্পবয়সি ছেলে-মেয়েরা আত্মহত্যা নামক বিষময় যন্ত্রণার শিকার হয়। পরিবার পরিজন কখনো সখনো দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে থাকে। সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে যদি কেউ পাশে দাঁড়াতে পারে সময় মতো তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই সেই ব্যক্তি রক্ষা শুধু নয় পুরো পরিবার বেঁচে যায়।

আত্মহত্যা, কারণ, প্রতিরোধ : সম্প্রতি বলিউডের মাত্র ৩৪ বছরের এক প্রতিষ্ঠিত অভিনেতার আত্মহত্যায় বলা যায় চলচ্চিত্র জগৎ শুধু নয়, সারা ভারতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর আত্মহত্যার কারণ নিয়ে তোলপাড়। বিনোদন জগতের অনেক রাঘববোয়াল জড়িত শোনা যাচ্ছে। আবার শিলিগুড়িতে পঁয়ষট্টি বছরের এক প্রতিষ্ঠিত নাট্যসংস্থার ব্যক্তিত্বের গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা অনেকের মতো আমার মনকেও নাড়া দিয়েছে। সারা বিশ্বে নাকি প্রতি চল্লিশ সেকেন্ডে একজন করে আত্মহত্যা করে থাকে। ভারতে আত্মহত্যা লক্ষাধিক হয়ে থাকে প্রতি বছর। মহিলাদের চেয়ে পুরুষরা বেশি আত্মহত্যা করে এদেশে। বিস্তারিত আলোচনার আগে এই প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা যেতে পারে। আত্মহত্যা বলতে বোঝায় ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের জীবন-বিসর্জন দেওয়া বা স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণনাশের প্রক্রিয়া। শাস্ত্রে বলে চুরাশি লক্ষ যোনি অতিক্রম করে নাকি মনুষ্য জন্ম। আত্মা নাকি অজর অমর। মৃত্যুর পর আত্মা একদেহ ত্যাগ করে অন্য দেহে যায়।

আত্মা নিয়ে অনেক তথ্য, দর্শন, বিবরণ আছে। কখনো আত্মা মানে অস্তিত্ব, চৈতন্যস্বরূপ। আত্মা বলতে জীবাত্মা বোঝায়। আত্মা পুরুষোত্তম ভগবানের অধীন। স্বামীজী বলেছেন, 'আত্মা সর্বশক্তিধর এবং সর্বব্যাপী'। নিগূঢ়ানন্দজীর মতে 'আত্মা এমন এক অধ্যাত্ম উপাদানে তৈরি যা স্থূল দেহের উপাদানের ঠিক বিপরীত।' এরকম আরও তথ্য, ব্যাখ্যা আছে আত্মাকে নিয়ে। আত্মহত্যাকে মহাপাপ বলা হয়ে থাকে। নানা কারণে আত্মহত্যা হয়ে থাকে দেশে বিদেশে। কখনো একাকীত্ব, মানসিক চাপ, দারিদ্রতা, দুর্বল স্বাস্থ্য, বেকারত্ব, দেউলিয়া, বিবাহ সম্পর্কিত, অবৈধ সম্পর্ক, সন্দেহ, ধর্ষণ, প্রেম ইত্যাদি। কখনো গলায় দড়ি দিয়ে, বিষ খেয়ে, গোলার নলি কেটে, হাতের শিরা কেটে, উঁচু স্থান থেকে লাফিয়ে, রেলগাড়ির নীচে ঝাঁপ দিয়ে, নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আরও নানা ভাবে আত্মহত্যা করে থাকে মানুষ।

আত্মহত্যার মূল কারণ মানসিক অবসাদ, প্রভাব প্রতিপত্তি, নাম-যশ, অর্থ সব থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই দেখা যায় মানুষ আত্মহত্যা করে চলে। বিশ্বে প্রতি বছর আনুমানিক দশ লক্ষাধিক মানুষ আত্মহত্যা করে থাকে। বিশ্বে আত্মহত্যাকারী পাঁচজনের মধ্যে দু' জন ভারতীয়। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোতে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা মিজোরাম মোটামুটি ষোলো শতাংশ কিন্তু পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশে, বিহারে চার শতাংশ মাত্র আত্মহত্যার হার। প্রতি ঘণ্টায় নাকি একজন করে বেকার আত্মহত্যা করে ভারতে। ১৯৯০-তে ভারতে যত আত্মহত্যা হয়েছিল তার থেকে ৪০.১ শতাংশ বেড়ে গেছে ২০১৯-এ। সারা বিশ্বে আত্মহত্যার তালিকায় ভারত নবম স্থানে। এটা ঠিক, এশিয়া মহাদেশে মানসিক রোগের হার পশ্চিমি দেশের চেয়ে কম।

ভারতে আত্মহত্যা একটি জনস্বাস্থ্য সংকট। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন কর্মশালার। যেমন কয়েক বছর আগে ব্যাঙ্গালুরু স্থিত 'নিমাহনস' সেন্টারের মানসিক বিভাগের চিকিৎসক অধ্যাপক সেনথিল রেড্ডির নেতৃত্বে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। দু'টি ভাগে হয়েছিল, যেমন ঝুঁকি, ধারণা ও প্রতিরোধ হস্তক্ষেপ। বিষয় ছিল আত্মহত্যা এবং নিজের ক্ষতি করার পার্থক্য।

প্রথমে আত্মহত্যাপ্রবণদের চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি বিষয়ে ধারণা, প্রতিরোধ প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ, লক্ষণ বিষয়ে সতর্ক হওয়া ইত্যাদি। জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করে আলোচনা চলে। 'তুমি একা নও' (You are not alone)। ইতিবাচক আলোচনা, সহানুভূতির সঙ্গে আত্মহত্যাপ্রবণ মানুষের সমস্যা শোনা জরুরি তাকে আত্মহত্যা থেকে নিরস্ত্র করতে। এটা ঠিক যে মানসিক চাপ নেওয়ার ক্ষমতা সব মানুষের সমান নয়। মানসিক শক্তি বাড়াতে যোগ, নাম, ধ্যান জরুরি। আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ জাগ্রত হলে আত্মহত্যার প্রবণতা কমে যাবে অবশ্যই। পরিবার, কার্যালয় প্রভৃতির সহকর্মীদের ভূমিকা এবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। বস্তুত আত্মহত্যা সমাধান নয়, বরং সমস্যা। আত্মহত্যার প্রবণতা আসলে নিজের কষ্ট অন্যের সঙ্গে কথা বললে মন অনেক হালকা হয়, আত্মহত্যার প্রবণতা বন্ধ হয়। আত্মহত্যা সাধারণত বেশি হয় পনেরো থেকে উনত্রিশ বা চল্লিশ বছরের মধ্যে।

১৯৯০ সালে ভারতে আত্মহত্যা হয়েছিল ১ লক্ষ ৬৪ হাজার, কিন্তু ২০১৬-তে তা হয়েছে ২ লক্ষ ত্রিশ হাজার। ২০১৬-তে ১,৪৫,৫৬৭ জন ভারতীয় যুবক আত্মহত্যা করে যাদের বয়স পনেরো থেকে চৌত্রিশের মধ্যে। কখনো ন্যূনতম জীবনযাপন করতে থাকে। সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে

যদি কেউ সময় বুঝে পাশে দাঁড়াতে পারে তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই সেই ব্যক্তি রক্ষা পায়।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্য যোগের ২০তম শ্লোকে বলা আছে যার অর্থ 'আত্মার কখনও জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না, অথবা পুনঃপুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি জন্মরহিত, শাশ্বত, সনাতন এবং পুরাতন হলেও চিরনবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না।' উপনিষদেও (১.২.১২) এমনটা বলা আছে যে, আত্মা পূর্ণ জ্ঞানময়, সে সর্বদাই পূর্ণ চেতন। তাই চেতনাই হচ্ছে আত্মার লক্ষণ। এমনকী আত্মাকে হৃদয়ের মধ্যে দেখা না গেলেও চেতনায় প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। □

শোকসংবাদ

ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর মহকুমার বাবুডুমরো গ্রামের স্বয়ংসেবক সৃষ্টিধর সাউয়ের মা শ্রীমত্যা বিলাসিনী সাউ গত ৪ জুলাই ৯৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁর ৩ পুত্র, নাতিরা সকলেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। ১৯৭০-এর পর থেকে ওই অঞ্চলে শাখার বৃদ্ধির জন্য সাউ পরিবার সর্বদা সচেষ্ট ছিল। এক নাতি লক্ষ্মীকান্ত সাউ দিল্লিতে সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত এবং বঙ্গ বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পুরুলিয়া জেলা কার্যবাহ দেবরাজ মাহাত'র মাতৃদেবী গত ১৬ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তথা স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার প্রসার প্রমুখ জয়রাম মণ্ডলের মেজদা লাবণ্য মণ্ডল দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ১৬ জুলাই বাঁকুড়া জেলার আঁধারথোল গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ৬ কন্যা ও নাতি- নাতনিদের রেখে গেছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, গত জন্মাষ্টমী '২২ থেকে স্বস্তিকার ৭৫ বছর পালনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই অবসরে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। সংরক্ষণযোগ্য এই গ্রন্থটি স্বস্তিকায় এযাবৎ প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখকদের নির্বাচিত রচনার সংকলন। যেমন— রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, কু সী সুদর্শন, মোহনরাও ভাগবত, দত্তোপন্ত ঠেংড়ী, এইচ ভি শেষাদ্রি, নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, সীতানাথ গোস্বামী, অসীম কুমার মিত্র, ভবেন্দু ভট্টাচার্য, কালিদাস বসু, দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, পবিত্র কুমার ঘোষ, রমানাথ রায়, অমলেশ মিশ্র, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, তথাগত রায়, অচিন্ত্য বিশ্বাস, জিষ্ণু বসু, শিবপ্রসাদ রায়, ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, দীনেশ সিংহ, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকের লেখায় সমৃদ্ধ হবে গ্রন্থটি। এটি আগামী অক্টোবর '২৩-এ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা।

গ্রন্থটির মূল্য ধার্য করা হয়েছে ৪০০ টাকা।

প্রকাশ পূর্ব মূল্য ৩০০ টাকা (অর্থাৎ ১৫ আগস্ট, ২০২৩ -এর মধ্যে যাঁরা সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়ে কপি বুক করবেন তাদের জন্য)।

১৫ জুন, ২০২৩ থেকে অনলাইনে ওই টাকা পাঠানো যাবে। অনলাইনে টাকা পাঠালে নীচের দেওয়া ফোন নম্বরে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। জেলা অনুসারে তালিকা-সহ টাকা জমা করতে পারেন।

যোগাযোগ—

শ্রী তপন সাহা — ৯৯০৩০০২৯০১

শ্রী মহিম দাস — ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭

অনলাইনে টাকা পাঠানোর Bank Details—

Name - Swastik Prakashan Trust
Bank - Punjab National Bank
Branch- Vivekanand Road, Kolkata-700006
A/c. No. - 0954000100121397
IFS Code - PUNB0095400

বিঃ দ্রঃ— নগদ টাকা স্বস্তিকা দপ্তরেই জমা দিতে হবে।
চেক দিলে Swastik Prakashan Trust—এই নামে চেক কাটতে হবে।

অঘটনের উইম্বলডন

নিলয় সামন্ত

প্রথম অঘটন, নোভাক জোকোভিচের বয়স ৩৬ এবং তাঁর ঝুলিতে ২৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যামে। তাঁকেই ফাইনালে হারিয়ে প্রথম বার উইম্বলডন ট্রফিটা হাতে নিলেন, কার্লোস আলকারাজ। ২০০৮ সালে নোভাক জোকোভিচ প্রথম গ্র্যান্ডস্ল্যাম জিতেছিলেন, সেই সময় কার্লোস আলকারাজের বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। ২০ বছরের আলকারাজ সেই জোকোভিচকে হারিয়ে খুশিতে মাতলেন। তিনি যে টেনিস দুনিয়া শাসন করতে এসেছেন তাঁর আভাস দিয়ে গেলেন উইম্বলডন মেনস সিঙ্গেলসের ফাইনালে।

প্রথম সেটে ১-৬ ব্যবধানে হেরে গিয়েছিলেন। কিন্তু অদম্য মানসিকতা নিয়ে প্রত্যাবর্তন ঘটালেন। আলকারাজ। চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে যে এই ভাবেই ফিরতে হয়, তার নজির রেখে গেলেন তিনি। গত বছর ইউএস ওপেন জিতেছিলেন আলকারাজ। এটি তাঁর দ্বিতীয় গ্র্যান্ডস্ল্যাম। গত বছর ফরাসি ওপেনের ফাইনালে তাঁর খেলা দেখতে এসেছিলেন স্পেনের রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ। আলকারাজ বলেন, 'আমি দু'বার সামনে থেকে স্পেনের রাজাকে দেখেছি। সেই দু'বারই আমি জিতেছি। তাই চাইব বার বার তিনি আমার খেলা দেখতে আসুন।'

২০ বছর বয়সে উইম্বলডন জিতে নিজের কোচ ও পরিবারকে ধন্যবাদ জানান আলকারাজ। সেই সঙ্গে জোকোভিচকে শুভেচ্ছা জানান তিনি। কোলে উইম্বলডনের ট্রফিটি নিয়ে আলকারাজ বলেন, 'আমি জোকোভিচের খেলা দেখেই খেলা শুরু করেছিলাম। ওর খেলা আমাকে অনুপ্রেরণা দেয়। আমার জন্মের আগে থেকে জোকোভিচ প্রতিযোগিতা জিততে শুরু করে দিয়েছিল।'

১৬ জুলাই ৪ ঘণ্টা ৪২ মিনিটের লড়াইয়ে ১-৬, ৭-৬ (৮-৬), ৬-১, ৩-৬, ৬-৪ গেমে ৩৬ বছরের জোকোভিচকে হারালেন ২০ বছরের আলকারাজ। হয়তো আগামীদিনে বেশ কয়েকবার মুখোমুখি হবেন তাঁরা। রাফায়েল নাদালের দেশের উদীয়মান টেনিস তারকার বিরুদ্ধে খেলার জন্য জোকোভিচও হয়তো পরের বার থেকে আরও বেশি প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন।

দ্বিতীয় অঘটন, মার্কেতা ভন্দ্রোসোভা উইম্বলডনের মহিলাদের সিঙ্গলসে ওপেন যুগে প্রথম অবাছাই হিসেবে ট্রফি হাতে তোলা। চেক প্রজাতন্ত্রের এই খেলোয়াড়ের কাছে আরও একটি বিশেষ ব্যাপার, গত বছর ১৬ জুলাই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। প্রথম গ্র্যান্ডস্ল্যাম জিতে প্রথম বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপন। স্ত্রী ফাইনালে ওঠার পর স্বামী স্টেপান সিমেক রাতারাতি উড়ে এসেছেন লন্ডনে। তিনি এত দিন ভন্দ্রোসোভার সঙ্গে ছিলেন না। আসলে স্টেপানকে সে ভাবে ভন্দ্রোসোভার সঙ্গে দেখাই যায় না। তার একটা কারণ আছে। ভন্দ্রোসোভা যখন বিশ্ব জুড়ে খেলে বেড়ান তখন স্টেপান বাড়িতে থেকে পোষা বিড়াল সামলান। স্ত্রী ফাইনালে ওঠার পরে সেই বিড়ালদের দায়িত্ব অন্য কারোর কাঁধে চাপিয়ে চলে এসেছেন। ভন্দ্রোসোভা ট্রফি হাতে তোলার সময় তাঁর চোখেও জল। ভন্দ্রোসোভা বললেন, 'কাল আমার প্রথম বিবাহবার্ষিকী। তার আগে সবাইকে একসঙ্গে দেখে খুব ভালো লাগছে। আমার বোন কাঁদছে। ইচ্ছে রয়েছে সবাইকে নিয়ে একটু বিয়ার খেতে যাব। গত কয়েকটা সপ্তাহ একটানা খেলে বিধ্বস্ত।'

২৪ বছরের ভন্দ্রোসোভা ছোটো থেকেই খেলার পরিবেশে বড়ো হয়েছেন। তাঁর দাদু জাতীয় স্তরে পেন্টাথলন চ্যাম্পিয়ন। মা পেশাদার ভলিবল খেলোয়াড় ছিলেন। ছোটো থেকেই টেনিসে দাপট দেখাতে থাকেন ভন্দ্রোসোভা। জুনিয়র স্তরে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন। সিনিয়র স্তরে এসে শুরুতেই চমক দিয়েছিলেন এই বাঁ হাতি খেলোয়াড়। ২০১৯ সালে ফরাসি ওপেনার ফাইনালে উঠেছিলেন। সেখান অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলে বার্টির কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। ২০১৯ সালে ক্রমতালিকায় সব থেকে উন্নতি (১৪) করেছিলেন তিনি। কিন্তু চোটের কারণে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে থাকেন। গত বছরও চোটের কারণে ছ'মাস কোর্টের বাইরে কাটতে হয়েছিল তাঁকে। ফলে ক্রমতালিকায় পিছিয়ে ৪৩ নম্বরে নেমে যান।

সেই ভন্দ্রোসোভা এবারের উইম্বলডনে সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন। ভেরোনিকা কুদেরমেতোভা (১২), ডোনা ভেকিচ (২০), মারিয়া বৌজকোভার (৩২)-এর মতো বাছাই খেলোয়াড়দের হারিয়েছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে হারের মুখ থেকে ফিরে চতুর্থ বাছাই জেসিকা পেগুলাকে হারিয়েছেন। সেমিফাইনালে হারান এলিনা সোয়াইতোলিনাকে। ফাইনালে তাঁর কাছে পরাজিত দ্বিতীয় বাছাই জাবেরও।

চোট সারিয়ে কোর্টে ফিরে একের পর এক প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাই কোর্টে প্রত্যাবর্তন কীভাবে করতে সেটাও তাঁর রক্তে। দুটি সেটেই এমন অবস্থায় ছিলেন যেখান থেকে অনায়াসে হেরে যেতে পারতেন। প্রথম সেটে ২-৪, দ্বিতীয় সেটে ৩-৪ পিছিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে একটানা গেম জিতে প্রতিপক্ষকে হারানো সহজ কথা নয়। সে কারণেই ভন্দ্রোসোভা বলেছেন, 'টেনিস খেলা বাকি সব কিছুর থেকে আলাদা। লাগলের মতো অনুভূতি হয়। প্রত্যাবর্তন কখনওই সহজ নয়। কোনও প্রত্যাশা রাখা যায় না। চোটের পরে এই উচ্চতাতেই নিজেকে দেখতে চাইছিলাম। ভালো লাগছে যে সেই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি।' □

ব্যাঙ্ককে আয়োজিত হতে চলেছে বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দ্য ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আগামী নভেম্বর মাসে ব্যাঙ্ককের কনভেনশন সেন্টারে 'দ্য ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেস-২০২৩' অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, যা হবে তৃতীয় বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন। ৩ দিন ব্যাপী এই সম্মেলনের থিম বা বিষয়বস্তু হলো- 'জয়স্য আয়তনাম্ ধর্মঃ'। বিশ্ব হিন্দু ফাউন্ডেশনের ম্যানেজিং ট্রাস্টি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফাউন্ডেশনের একজন ট্রাস্টির দায়িত্বে রয়েছেন। হিন্দু সংগঠন সমূহের প্রতিনিধি ও প্রথিতযশা বৌদ্ধ আচার্যদের সঙ্গে ওই সম্মেলনের আমন্ত্রিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, অমৃত বিশ্ব বিদ্যাপীঠমের আচার্য অমৃতানন্দময়ী মা। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইওরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া-সহ বিশ্বের সমস্ত প্রান্ত হতে ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তি মিলিয়ে হিন্দু সমাজের বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের সম্মেলনস্থল হয়ে উঠতে চলেছে ব্যাঙ্কক। ৬০টিরও বেশি দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজিত হতে চলা এই সম্মেলনের লক্ষ্য হলো হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করা, বিশ্ব জুড়ে হিন্দু সমাজ যে সকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তার মোকাবিলা করার পন্থা নির্ণয় করা, ধার্মীয় মতাদর্শ বিনিময়, কৌশলগত সহযোগিতা ও বিশ্ব ব্যাপী হিন্দুধর্ম প্রচারের পদ্ধতি অন্বেষণ। সেই লক্ষ্যে উপযুক্ত নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনকারী হিন্দু সংগঠক, কার্যকর্তা ও চিন্তাবিদদের একজোট করে হিন্দু সমাজের ঐক্যবদ্ধ সত্তার পরিচায়করূপে এই মহতী সম্মেলন ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সমবায় আন্দোলনে নতুন দিশা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ১৪ জুলাই নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র তথা সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ সমবায়ক্ষেত্রের ফার্মারস্ প্রোডিউসারস্ অর্গানাইজেশন (এফপিও) সমূহের ন্যাশনাল মেগা কনক্লেভের উদ্বোধন করলেন এবং প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি (পিএসিএস) সমূহের দ্বারা ১১০০টি নতুন এফপিও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন। প্রথাগত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের প্রান্তিক কৃষকদের আর্থিক ভাবে সচ্ছল করাই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। পিএসিএস সমূহের সঙ্গে একযোগে সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের সমস্ত এফপিওগুলিকে তাদের কার্যকলাপ অব্যাহত রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, ভারতে প্রায় ৬৫ কোটি মানুষ কৃষি সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত। স্বাধীনতার অমৃত কালে দেশজুড়ে সমবায় আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনই কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য। এই কারণে বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে বাজেট আগের তুলনায় ৫.৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ বর্ষে যা ছিল ২১ হাজার কোটি টাকা, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে তা বেড়ে হয়েছে ১.১৪ লক্ষ কোটি টাকা।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর ফ্রান্স সফরকালে ১৩ জুলাই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁ মোদীজীকে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান 'দ্য গ্র্যান্ড ক্রস অফ্ দ্য লিজিয়ন অফ্ অনার'-এ ভূষিত করলেন। কোনো দেশের নাগরিক বা সামরিক ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য এই সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে। ফ্রান্স-ভারত পারস্পরিক কূটনৈতিক সম্পর্কের নতুন শিখর স্পর্শ করার ক্ষেত্রে এই সম্মান এক

অন্যতম দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ফ্রান্স সফরকালে মোদীজী ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এলিজাবেথ বোর্ন ও ফ্রান্সের সেনেট লিডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পারফর্মিং আর্টস্ সেন্টার লা সেইন মিউজিকালে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তাঁকে দেওয়া এই সর্বোচ্চ সম্মানের মাধ্যমে ফ্রান্সের পক্ষে ১৪০ কোটি ভারতীয়কে সম্মানিত করা হয়েছে বলে মোদীজী উল্লেখ করেন। এরপর মোদীজী ফরাসি প্রেসিডেন্টের বাসভবনে প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁ ও তার স্ত্রী ব্রিজেট ম্যাক্রঁর সঙ্গে নৈশভোজে মিলিত হন। ১৪ জুলাই প্যারিসে ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল ডে বা বাস্তিল দিবস উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজী 'সম্মানিত অতিথি'-র আসন অলংকৃত করেন।

।। চিত্রকথা ।। মহামানব মহানামব্রত ।। ৫৩ ।।

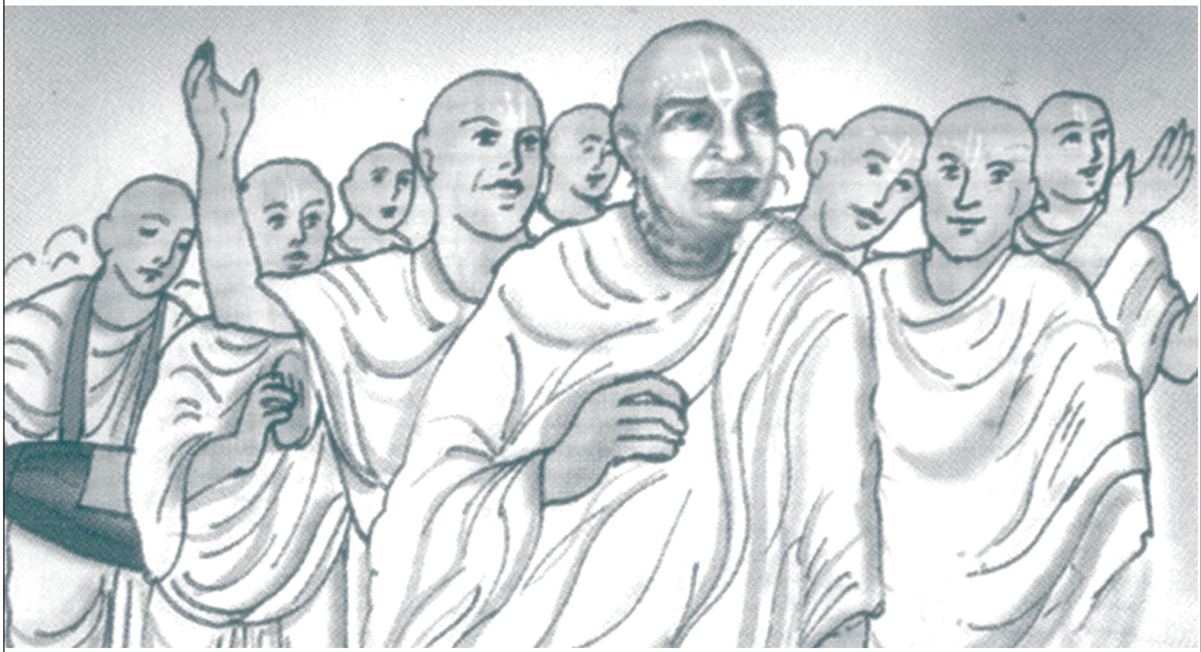

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ৫০০ বছর পূর্তিতে বাংলাদেশে জয়ন্তী পরিষদ গঠন করলেন মহানামব্রতজী। শ্রীহট্টের অদ্বৈতধাম থেকে গৌর পরিক্রমার সূচনা করা হলো। বিরামহীন ভাবে মহানামব্রতজী সারা দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

তাঁর আমেরিকা বিজয়ের স্মরণে কলকাতায় দশ দিন ধরে একটি কর্মসূচি নেওয়া হলো— মহানাম মেলা। এটা ছিল শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান।

(ক্রমশ)